নির্বাচিত

দারসে কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

জুনাব আলী ভূঁইয়া

নির্বাচিত

দারসে কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

নির্বাচিত দারসে কুরআন

[দ্বিতীয় খণ্ড]

জুনাব আলী ভূঁইয়া

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাঁটাবন ❖ বাংলাবাজার

নির্বাচিত দারসে কুরআন-২

জুনাব আলী ভূঁইয়া

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহ্সান পাবলিকেশন
১৯১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩৫৩১২৭

ISBN 984-32-1681-5

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫
তৃতীয় প্রকাশ : এপ্রিল-২০১১
জমা. আউয়াল : ১৪৩২

প্রচ্ছদ

মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পোজ : মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহ্মদ
আহ্সান কম্পিউটার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

মুদ্রণ
মীম প্রিন্টার্স
বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা

বিনিময় : একশত টাকা মাত্র

Nirbachito Dars-e-Quran 2nd Part by Junab ALi Bhuiyan and Published by **Ahsan Publication** 191 MoghBazar (Wireless Railgate) Dhaka-1217, First Edition December 2005, Third Edition April-2011 Price Tk. 100.00 ($ 2.00) Only.

A.P-36

লেখকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিভিন্ন প্রকার ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তবে আল-কুরআন অধ্যয়নের মজাই আলাদা। দুনিয়ার অন্যসব কিছুতে ভেজাল থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কালামে কোন ভেজাল নেই। তাই আল-কুরআনের বিশুদ্ধ চর্চাই আল্লাহর রেজামন্দি লাভের সহজ সরল পথ বলে আমি মনে করি।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এ পথে একা অগ্রসর না হয়ে আরও কিছু ভাইকে এ পথে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা দানের উদ্দেশ্যেই এ দারস সিরিজ লিপিবদ্ধ করা হলো।

আমার বইখানা যদি পাঠকদের কিছুটা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

আসলে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অধ্যবসায় মানুষকে সাফল্যের পথে নিয়ে যায়। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পর আরও একটি খণ্ড লিখতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এরপর আরও দুই-একখানা গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা পোষণ করি। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যেন তাওফীক দান করেন।

আমার ছেলেরা প্রকাশনার সাথে জড়িত। তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ পাওয়াতে আমার অনেক উপকার হয়েছে। আমি তাদের সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

পরিশেষে মহান প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমাকে এ কাজে আরো তাওফীক দান করেন। এ কাজে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দয়াময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ প্রচেষ্টা যেন আল্লাহ তায়ালা আমার এবং আমাকে যারা লেখাপড়া শিখিয়ে লালন-পালন করে মানুষ করেছেন তাঁদের নাজাতের ওসীলা করেন, আমীন।

তারিখ : ২০ জুন, ২০০৫

জুনাব আলী ভূঁইয়া
বোয়ালিয়া, বরুড়া, কুমিল্লা।

ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামীন তাঁর কালাম আল-কুরআন মহা বরকতময় কদরের রাতে প্রথম নাযিল করেন। তারপর মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতী জীবনের দীর্ঘ ২৩টি বছর ধরে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবীর নিকট আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআন ধারাবাহিকভাবে নাযিল করেন।

আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন চালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করা হয়েছে। জীবন সমস্যার এমন কোন দিক বা বিভাগ নেই যার সমাধান আল্লাহ্ পেশ করেনি। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ। এরপর আর কোন কিতাব অথবা রাসূল মানবজাতির জন্য প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ আর কোন বিধান আমাদের নিকট প্রেরণ করবেন না।

এই কুরআন জানা, কুরআন মানা ও কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন একজন মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। তাই আল-কুরআন অধ্যয়ন, আল-কুরআনের দারস দান, আল-কুরআনের দারস শোনা আমাদের অতীব প্রয়োজন।

আলহামদু লিল্লাহ, মুসলমানদের বিরাট একটা অংশ এ কাজটি অব্যাহতভাবে করছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিপুল অংশই কুরআন জানে না, মানা ও বাস্তবায়ন তো তাদের দ্বারা সম্ভবই নয়। তাই আল-কুরআনের জ্ঞানচর্চা ও মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া মুমিনদের জন্য সর্বপ্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই তো রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী, তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন, "যার অন্তরে আল-কুরআনের কোন জ্ঞান নেই তা বিরাণ ঘরতুল্য।" (তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপি পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অতি উজ্জ্বল হবে।" (আবু দাউদ, মিশকাত)

আল-কুরআনের দারস দান পদ্ধতি

১। যে ব্যক্তি দারস দিবেন তার দারস শোনার জন্য অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, বুঝার ক্ষমতা, সুযোগ, ঈমানী চেতনা, চিন্তাশক্তি, দূরদর্শিতা, ব্যস্ততা, চাহিদা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাসম্ভব জানা থাকতে হবে।

২। আল-কুরআনের কোন সূরার যে অংশটুকু আপনি দারস দিবেন তার মধ্যে সে অংশের শুদ্ধ তিলাওয়াত, বংগানুবাদ, সূরার পরিচিতি, নামকরণ, মূল বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক পটভূমি, ব্যাখ্যা, শিক্ষা ও বাস্তবায়ন এ কয়েকটি দিক অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৩। উপরোক্ত পয়েন্টগুলো ছাড়াও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তার বাইরেও প্রয়োজনবোধে দারসকে শ্রুতিমধুর করার জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে আরও কিছু পয়েন্ট সংযোজন করা যায়। যেমন দারসের প্রথমে হাম্‌দ ও দরূদ শরীফ, অনুবাদের পর সম্বোধন ও সালাম এবং শেষভাগে ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও তাওফীক কামনা করে সালামের সাথে সমাপ্তি ঘোষণা।

৪। শ্রোতাদের অবস্থা দেখে তাদের চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে। শ্রোতাদের যদি ঈমানের দুর্বলতা থেকে যায় তবে আমলের ওয়াজ করলে লাভ হবে না।

৫। দারসের সময়সীমা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সময়ের মধ্যে তিলাওয়াত পাঁচ মিনিট, তরজমা পাঁচ মিনিট, সম্বোধন দুই মিনিট, নামকরণ, সূরা পরিচিতি ও নাযিলের প্রেক্ষাপট সাত মিনিট, ব্যাখ্যা পঁচিশ মিনিট, শিক্ষা ও বাস্তবায়ন দশ মিনিট নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সূচীপত্র

আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণগান, তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করে দারস শুরু করতে পারেন। যেমন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দারস : ১

আল-কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত এবং মুত্তাকীদের পরিচয়

২. সূরা আল-বাকারা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২৮৬, রুকূ-৪০

আলোচ্য আয়াত নং- ১-৫ পর্যন্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) الٓمّٓ - (٢) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. (٣) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. (٤) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. (٥) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (১) আলিফ লাম মীম। (২) এটি ঐ কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তা মুত্তাকীদের জন্য মুক্তিপথের দিশারী, (৩) যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (৪) আর যে কিতাব তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সেগুলোর উপরও ঈমান আনে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান আছে। (৫) তারা নিজেদের প্রভুর সৎপথের অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ লাভের অধিকারী।

শব্দার্থ : الٓمٓ - আলিফ-লাম-মীম। ذٰلِكَ - সেই, رَيْبَ - সন্দেহ, هُدًى - সৎপথ প্রদর্শক, مُتَّقِيْنَ - পরহেযগার, يُؤْمِنُوْنَ - বিশ্বাস করে, بِالْغَيْبِ - অদৃশ্যে, يُقِيْمُوْنَ - প্রতিষ্ঠিত করে, مِمَّا - তা হতে যা, رَزَقْنٰهُمْ - তাদেরকে আমরা রিযিক দিয়েছি, يُنْفِقُوْنَ - তারা খরচ করে, بِمَا - ঐ বিষয়ে যা, اُنْزِلَ - নাযিল করা হয়েছে, اِلَيْكَ - তোমার উপর, قَبْلِكَ - তোমার পূর্বে, يُوْقِنُوْنَ - দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, اُولٰٓئِكَ - তারাই (প্রতিষ্ঠিত), هُدًى - সত্য পথের, رَبِّهِمْ - তাদের প্রভুর, هُمْ - যারা, مُفْلِحُوْنَ - কল্যাণ লাভকারী।

নামকরণ : এই সূরার ৬৭ নং আয়াত وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط - "যখন মূসা তাঁর জাতিকে বললো, আল্লাহ্ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন।"

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈল জাতিকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতের বাকারা শব্দটিকেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বাকারা মানে গাভী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার শিরোনামের পরিবর্তে আলামত স্বরূপ নাম রেখেছেন। এখানেও আলবাকারা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরার বেশীর ভাগ অংশ মাদানী যিন্দেগীর প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। সুদ নিষিদ্ধকরণ আয়াতগুলো তাঁর যিন্দেগীর একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়। যে আয়াতগুলো দ্বারা সমাপ্তি হয়েছে, সেগুলো হিজরতের পূর্বে মক্কী যুগে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের ক্রমধারার সাথে মিল রেখেই এভাবে সাজানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : ঐতিহাসিক পটভূমি ভাল করে বুঝে না নিলে এ সূরাকে সহজে বুঝা সম্ভব হবে না।

(১) হিজরতের পূর্বে ইসলামী দাওয়াতের কথা সাধারণত মক্কার মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। তাদের নিকট ইসলামের এই বাণী ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। হিজরতের পর ইসলামের দাওয়াত ইহুদীদের সম্মুখীন হলো। তারা হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবের অনুসারী হয়ে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ওহী ও ফেরেশতায় বিশ্বাসী ছিল। বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে এবং নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা তাওরাতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে তার সাথে মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। তারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, কোন প্রকার সংস্কার সংশোধন নিয়ে যদি কেউ অগ্রসর হতো তবে তারা তাঁকে দুশমন মনে করে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত সহস্র বছর ধরে এই একই ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে।

দীন বহির্ভূত বিষয়গুলো দীনের মধ্যে শামিল, ছোটখাট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহ্কে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলিম নাম ভুলে গিয়ে নিছক ইহুদী নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে ধরে রেখেছিল। ১৫ ও ১৬ রুকূতে ইহুদীদের সমালোচনা করে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার মুকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পেশ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মুকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

(২) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের একটি নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতির প্রচার এবং দীন গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের মধ্যেই দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল।

হিজরতের পর মদীনায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন আল্লাহ তায়ালা

সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় মৌলিক নির্দেশ জারী করতে থাকেন। ইসলামের ভিত্তির উপর নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পন্থাও বলে দিলেন।

(৩) হিজরতের পূর্বে কাফেরদের ঘরেই ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছিল। যেসব লোক দাওয়াত গ্রহণ করছিল, তারা নিজ নিজ স্থান থেকেই দাওয়াতী কাজ করতো এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নির্মম অত্যাচার ও যুলুম-পীড়ন ভোগ করতো। কিন্তু হিজরতের পর বিক্ষিপ্ত মুসলিমগণ যখন একত্র হয়ে ক্ষুদ্রায়তন একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো, তখন একদিকে এই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র, আর অপরদিকে সমগ্র আরবদেশ একত্র হয়ে তার ধ্বংসের চেষ্টায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিল। তখন এই মুষ্টিমেয় সংখ্যাবিশিষ্ট দলের সাফল্য ও অস্তিত্ব নির্ভর করতে লাগলো প্রধানত পাঁচটি কাজের উপর।

এক– পূর্ণ শক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও হেকমতের সাথে দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে ইসলামের অনুসারী করার চেষ্টা করা।

দুই– বিরোধীরা ভ্রান্ত পথের অনুসারী, বিষয়টি তাদের এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোন বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে।

তিন– তারা আশ্রয়হীন, প্রবাসী ও সমগ্র দেশের শত্রুতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখী হওয়ার দরুন দারিদ্র্য, উপবাস এবং সর্বদা অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার অস্বস্তিকর অবস্থার শিকার হয়েও তারা হতাশ না হয়ে পূর্ণ ধৈর্যসহকারে এই প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করে এবং তাদের সংকল্পে কোনরূপ দুর্বলতা প্রবেশ করতে দেয় না।

চার– ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে কোন দিক থেকে সশস্ত্র আক্রমণের মুকাবিলা করার জন্য ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে তাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। বিরোধী পক্ষের জনসংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।

পাঁচ– ঈমানদারদের মধ্যে এমন সুদৃঢ় সাহস ও হিম্মত জাগিয়ে তুলতে হবে

যাতে আরববাসীরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে আপোষে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলী ব্যবস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে দ্বিধা-সংকোচ করবে না।

আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তায়ালা এই পাঁচটি কাজের প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে মুনাফিকের দল আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। নবী করীম (সা)-এর মক্কী যিন্দেগীর শেষের দিকে মুনাফিকির প্রাথমিক আলামত লক্ষ্য করা যায়।

(ক) মক্কার মুনাফিকের স্বরূপ ছিল এমন– তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু ইসলামের খাতিরে কোন ত্যাগস্বীকার করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর আরও অনেক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী মুনাফিক দল ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইসলামী দলে প্রবেশ করতো।

(খ) দ্বিতীয় মুনাফিক দলের অবস্থা এই ছিল যে, ইসলামী কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে ইসলাম ও অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের অংশ ভোগ করতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপটা থেকেও রক্ষা পেতো।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ছিল। তাদের বংশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করায় তারাও বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করতো, কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করে ইসলামের নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে তাদের মন চাইতো না।

মহান আল্লাহ এই সূরায় তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছেন। পরবর্তী

কালে তাদের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা : (ক) - الٓمّٓ - এরূপ "হুরূফে মুকাত্তাআত"– বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ আল-কুরআনের অনেক সূরার শুরুতে আছে। আল্লাহ পাকই এসব সম্পর্কে সঠিক ও সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী। কুরআন মজীদের ২৯টি সূরায় পুনরুক্তিসহ মোট ২৮টি অক্ষর এসেছে। পুনরুক্ত অক্ষরগুলো বাদ দিয়ে সূরাসমূহের প্রথমে এ প্রকারের চৌদ্দটি অক্ষর এসেছে। অক্ষরগুলো হচ্ছে–

ا ل م ص ر ك ه ى ع ط س ح ق ن

এগুলোর অর্থ জানা একজন পাঠকের জন্য আবশ্যক নয়। কারণ এগুলোর অর্থ জানা কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের ক্ষেত্রে শর্ত নয়।

(খ) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - "এটি সেই কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।" ذٰلِكَ - ঐ, هٰذَا - এই। এখানে আরবী ভাষায় এই দুইটি শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একে অপরের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবরা এতদুভয়ের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য করেন না। ذٰلِكَ প্রকৃতপক্ষে দূরের ইঙ্গিতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কখনও কখনও নিকটবর্তী বস্তুর জন্যও আসে। তখন তার অর্থ হবে 'এই'।

এখানে ذٰلِكَ الْكِتَابُ দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে।

দুনিয়ায় মানুষের বুদ্ধিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয় নিয়ে ধারণা, কল্পনা ও আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে যতগুলো গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, এগুলোর লেখকগণ নিজেদের গ্রন্থাবলীর নির্ভুলতা সম্পর্কে যত শপথই করুক না কেন তাদের গ্রন্থাবলী সন্দেহমুক্ত নয়। কিন্তু এ কুরআন মজীদের রচয়িতা এমন এক সত্তা যিনি সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞান রাখেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিকট বর্তমান। কাজেই এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

(গ) هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - "এটি মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত।" এই পথ নির্দেশিকা গ্রন্থ থেকে হেদায়াত পেতে হলে মানুষকে মুত্তাকী হতে হবে। ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকতে হবে। ভালোকে

গ্রহণ এবং মন্দ বর্জন করা মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে তাকে আগ্রহী হতে হবে। যারা দুনিয়ায় পশুর মতো জীবন যাপন করে, নিজেদের কৃতকর্ম সঠিক কিনা সে ব্যাপারে কোন চিন্তা করে না, দুনিয়ায় গড্ডালিকা প্রবাহে যারা গা ভাসিয়ে দেয়, তার নফস তাকে যেদিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অথবা মন যেদিকে যেতে চায় সেদিকে চলতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য আল-কুরআনে কোন পথনির্দেশ নেই।

ঐসব মুত্তাকীদের জন্য এ গ্রন্থ 'হেদায়াত' বা পথপ্রদর্শক হবে যারা কিছু মৌলিক গুণ অর্জন করতে পেরেছে। সেই গুণগুলো হলো :

(١) اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (٢) وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ (৩) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ. (٤) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. (٥) وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

১। "যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, ২। নামায প্রতিষ্ঠিত করে, ৩। যে রিযিক আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে, ৪। তোমার উপর যে ওহী এবং তোমার আগে যেসব ওহী নাযিল হয়েছিল, সেগুলোর উপর ঈমান রাখে, ৫। আর আখেরাতের উপরও ঈমান আনে।" এগুলোই মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য।

১। অদৃশ্যে ঈমান আনয়ন– যা দেখা যায় না, শোনা যায় না এবং অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা অনুভব করা যায় না, অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত এবং মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। যেমন আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ওহী, ফেরেশতা, আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি। এ সত্যগুলোকে না দেখে বিশ্বাস করা এবং প্রদত্ত খবরের উপর আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে ঈমান বিল-গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস।

আল-কুরআন থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই হেদায়াত বা পথনির্দেশ লাভ করবে যে এই না দেখা সত্যগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত হবে। আর যদি কেউ এমন চিন্তা করে যে, না দেখে, না বুঝে, পরিমাপ বা ওজন না করে, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বাদ আস্বাদন না করে বোকার মত কোন জিনিস আমি মেনে নিতে পারি না, সে এ কিতাব থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না।

২। নামায কায়েম করা– কোন নির্দিষ্ট স্থানে আযানের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে নামাযের জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়ে সামষ্টিকভাবে জামায়াতবদ্ধ হয়ে নামায পড়াকে 'ইকামতে সালাত' বলে। আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তব ও স্থায়ী নমুনা হচ্ছে নামায। মুয়ায্যিন প্রতিদিন পাঁচবার নামাযের জন্য আহ্বান জানায়, ঈমানের দাবিদার কোন ব্যক্তি এ আহ্বানে সাড়া না দিলে বুঝা যাবে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করেছে। কোন লোকালয়ে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত নামায আদায় করে, কিন্তু জামায়াতের সাথে ফরয নামায পড়ার ব্যবস্থা না করে থাকে, তবে সেখানে নামায কায়েম আছে, একথা বলা যায় না।

কাজেই আল-কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের তৃতীয় শর্তই হলো, কোন ব্যক্তি চুপচাপ বসে না থেকে নামায কায়েম করার জন্য তৎপর হবে। সমাজের অন্যান্য ঈমানদার লোকদের সংগঠিত করে জামায়াতে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

৩। যে রিযিক আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে– বান্দা প্রথমেই স্বীকার করে নেয় যে, তাদের ধন-সম্পদ যা কিছু আছে তা আল্লাহ প্রদত্ত, তাদের নিজেদের সৃষ্ট বা উপার্জিত নয়। কাজেই এ সম্পদে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার রয়েছে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে খরচ করা প্রথম কর্তব্য।

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হকদার হচ্ছে তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিরা। অতঃপর দূরের লোক। প্রথমে সাধারণ দান-সদকার বিধান প্রবর্তিত হয়েছিল। পরে যাকাত একটা স্বতন্ত্র বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নাযিল হয়। কিন্তু সাধারণ দান-সাদকাও এর পাশাপাশি চালু থাকে। আল্লাহ তায়ালা সূরা তাগাবুনের ১৭-১৮ নং আয়াতে বলেছেন :

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ.

"যারা দিলের সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে আছে তারাই কামিয়াব। তোমরা

আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিলে তিনি তা তোমাদের জন্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে ফেরৎ দিবেন।"

আল্লাহ তায়ালা সূরা মুনাফিকূনের ১১ নং আয়াতে বলেন :

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّارَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ.

"আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই খরচ কর।"

কাজেই সংকীর্ণমনা ও অর্থলোলুপ না হয়ে মানুষকে হতে হবে আল্লাহর ও বান্দার হক আদায়কারী।

বখিলী চরিত্রের লোকদের মত ঈমানদার ব্যক্তি হাত গুটিয়ে রাখবে না। সে আল্লাহর পথে বে-হিসাব ব্যয় করবে, আর এ বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহর ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি বান্দাকে পরীক্ষা করেন মাত্র। তিনি এই দুনিয়ায়ই বান্দাকে তার ব্যয়িত সম্পদ কয়েক গুণ বেশী করে ফেরৎ দিতে পারেন।

৪। তোমার উপর এবং তোমার পূর্বে যেসব ওহী নাযিল হয়েছিল তার প্রতি ঈমান আনে- আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও পূর্ববর্তী নবীগণের উপর বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন সেসবের উপরও ঈমান আনতে হবে। যারা এগুলোকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া মতবাদকে আল্লাহর বিধান বলে চালিয়ে দেয় এবং তাদের বাপ-দাদারা যেগুলোকে মেনে আসছে সেগুলো ছাড়া অন্যগুলোকে অস্বীকার করে তাদের সকলের জন্য আল-কুরআনের হেদায়াতের দরজা বন্ধ। আল-কুরআন তার অনুগ্রহ কেবলমাত্র তাদের উপর বর্ষণ করে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে। যারা বংশ, গোত্র বা জাতি প্রীতিতে লিপ্ত হয় না, বরং নির্ভেজাল সত্যের প্রতি অনুগত, সত্য যেখানে যে আকৃতিতে আবির্ভূত হোক তার সামনে তারা মাথা নত করে দেয়।

৫। আর যারা আখেরাতের উপর ঈমান আনে- এটি ষষ্ঠ ও সর্বশেষ শর্ত। আখেরাত একটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। আকীদা-বিশ্বাসের

বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টির ভিত্তিতে এ আখেরাতের ভাবধারা গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসের নিম্নোক্ত উপাদানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

এক : এ দুনিয়ায় মানুষ কোন দায়িত্বহীন জীব নয়। নিজের সমস্ত কাজের জন্য তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

দুই : দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা চিরন্তন নয়। একটি মুহূর্তে এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং সেই সময়টা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

তিন : এ দুনিয়া শেষ হবার পর আল্লাহ আর একটি দুনিয়া তৈরী করবেন। সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের জন্ম হয়েছে সবাইকে সেখানে একই সংগে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। সবাইকে একত্র করে তাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব নিবেন। সবাইকে নিজ নিজ কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।

চার : আল্লাহর এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সৎ লোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে এবং অসৎ লোকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

পাঁচ : বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রশ্চাতপদতা, সাফল্য ও ব্যর্থতা আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহর শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্রে যাবে সে-ই হচ্ছে সফলকাম আর সেখানে যে উতরাবে না সে ব্যর্থ।

এ সমগ্র আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে যারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি তারা কুরআন থেকে কোনক্রমেই উপকৃত হতে পারবে না। কারণ এ বিষয়গুলো অস্বীকার করা তো দূরের কথা, এগুলো সম্পর্কে কারো মনে যদি সামান্যতম দ্বিধা ও সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে মানুষের জীবনের জন্য কুরআন যে পথ নির্দেশ করেছে সে পথে তারা চলতে পারবে না।

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (৬)

"তারাই নিজেদের প্রতিপালকের পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।"

সূরা বাকারার প্রথম চারটি আয়াতের উপর ঈমান ও আমলের দ্বারাই মুত্তাকী হওয়া যায়। তৃতীয় আয়াতে মুত্তাকীর যে ৫টি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে, যারা এগুলো হাসিল করতে পারেনি তারা ব্যর্থ। আর যারা এ

গুণগুলো হাসিল করতে পেরেছে তারা সফলকাম হয়েছে। আর মুত্তাকীরাই আল্লাহর পছন্দনীয় পথে আছে এবং তারাই পূর্ণ সফলতা লাভ করবে।

শিক্ষা : ১। আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা দিয়ে বলেছেন– এই শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল-কুরআনের মধ্যে কোন সন্দেহপূর্ণ কিছু নেই।

২। সূরা ফাতেহায় আমরা যে সরল পথ প্রার্থনা করেছিলাম, এখানে সেই সরলপথ মানুষকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩। পাঁচটি গুণবিশিষ্ট মুত্তাকীরাই আল-কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য (যা পূর্বে উক্ত হয়েছে)।

বাস্তবায়ন : মানুষকে আল্লাহ তায়ালা আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল-কুরআন থেকে হেদায়াত নিয়ে ঈমান ও আমলের দ্বারা আমরা সকলে যেন আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা) হিসাবে ভূষিত হতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে দারস এখানেই শেষ করছি।

দারস : ২

দলবদ্ধ জীবন যাপন, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদান

৩. সূরা আল ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২০০, রুকূ-২০

আলোচ্য আয়াত : ১০২, ১০৩, ১০৪।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٠٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. (١٠٣) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. (١٠٤) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১০২) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। প্রকৃত মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) সবাই মিলে তোমরা আল্লাহ্‌র

রজ্জু (দীনকে) মযবুতভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ করো যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছিলেন। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। তিনি তোমাদের মন মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা একটি অগ্নিকুণ্ডের নিকটবর্তী ছিলে, সেখান থেকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। হয়তো এই নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের কল্যাণের সরল সোজা পথের সন্ধান পাবে। (১০৪) তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দকাজে বাধা দেবে। এ দায়িত্ব পালনকারীগণ সফলতা লাভ করবে।"

শব্দার্থ : اِتَّقُوا - তোমরা ভয় করো, حَقَّ - যথোপযুক্ত, تُقٰتِهٖ তাঁর ভয়, لَا - না, تَمُوْتُنَّ - তোমরা মৃত্যুবরণ করো, اِلَّا - ব্যতীত, مُسْلِمُوْنَ - মুসলমান, اِعْتَصِمُوْا - তোমরা শক্তভাবে ধরো, بِحَبْلِ - রজ্জুকে, جَمِيْعًا - সবাই একত্রে, لَا تَفَرَّقُوْا - তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না, اُذْكُرُوْا - তোমরা স্মরণ করো, نِعْمَتَ - নেয়ামতের, اِذْ - যখন, كُنْتُمْ - তোমরা ছিলে, اَعْدَآءً - শত্রু, فَاَلَّفَ - তখন মিলিয়ে দিলেন। بَيْنَ - মাঝে, قُلُوْبِكُمْ - তোমাদের অন্তরের, فَاَصْبَحْتُمْ - তোমরা হয়ে গেলে, بِنِعْمَتِهٖ - তাঁর অনুগ্রহে, اِخْوَانًا - ভাই ভাই, كُنْتُمْ - তোমরা ছিলে, شَفَا - কিনারায়, حُفْرَةٍ - গর্তের, مِنَ النَّارِ - আগুনের, فَاَنْقَذَكُمْ - অতঃপর তোমাদেরকে উদ্ধার করলেন, مِنْهَا - তা হতে, كَذٰلِكَ - এভাবে, يُبَيِّنُ - বর্ণনা করেন, اٰيٰتِهٖ - তাঁর আয়াতসমূহ, لَعَلَّكُمْ - তোমরা যাতে, تَهْتَدُوْنَ - সঠিক পথ পাও, وَلْتَكُنْ - এবং অবশ্যই থাকবে, مِنْكُمْ - তোমাদের মধ্যে, اُمَّةٌ - একদল, يَدْعُوْنَ - তারা ডাকবে, اِلَى الْخَيْرِ - কল্যাণের দিকে, يَاْمُرُوْنَ - তারা নির্দেশ দেয়, بِالْمَعْرُوْفِ - ভাল

কাজের, يَنْهَوْنَ - তারা নিষেধ করে, مُنْكَرِ - মন্দ, أُولَٰئِكَ - ঐসব লোক, مُفْلِحُوْنَ - সফলকাম।

নামকরণ : এই সূরার ৩৩ নং আয়াতে "আল ইমরান"-এর কথা বলা হয়েছে। একেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহ : নাযিল হওয়ার দিক থেকে সূরাটি চারটি ভাষণে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১ম ভাষণ– সূরার শুরু থেকে চতুর্থ রুকূর প্রথম দুই আয়াত পর্যন্ত যা বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

২য় ভাষণ– চতুর্থ রুকূর তৃতীয় আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূর শেষ পর্যন্ত তা চলেছে। নবম হিজরীতে নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

৩য় ভাষণ– সপ্তম রুকূর প্রথম থেকে দ্বাদশ রুকূর শেষ পর্যন্ত তা চলেছে। ভাষণটি ১ম ভাষণের সমসাময়িক কালেই নাযিল হয় বলে মনে হয়।

৪র্থ ভাষণ– ত্রয়োদশ রুকূর শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ওহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়সমূহ : এই চারটি ভাষণের মূল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর ঐক্য ও সামঞ্জস্যই ভাষণগুলোকে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে। এই সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি হচ্ছে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) আর অপরটি হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদী (সা)।

প্রথম দলটিকে সূরা বাকারার অনুরূপ এই সূরায় আরও অধিক জোরালোভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তাদের আকীদার ভ্রান্তি ও নৈতিক ক্রটির উল্লেখ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে : এই রাসূল এবং এই কুরআন এমন এক দীনের দিকে আহ্বান করছে যে দীনের দিকে প্রথম থেকে সকল নবী-রাসূল দাওয়াত দিয়ে আসছেন এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত

প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। দীনের এই সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছ তা তোমাদের নিজস্ব আসমানী কিতাবসমূহের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই তোমরা এই মহান সত্যকে গ্রহণ কর, যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পার না।

দ্বিতীয় দল যাদেরকে সর্বোত্তম জাতিরূপে সত্যের ধারক ও পৃথিবীর সংস্কারক হিসাবে দায়িত্বশীল করা হয়েছে, এই সূরায় তাদেরকে পূর্বাপেক্ষা অধিক উপদেশ দান করা হয়েছে। অতীতের উম্মতদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরে তা থেকে দূরে থাকার জন্য তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারক জাতি হিসাবে সে কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলে কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান যারা আল্লাহ্‌র পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের সময় তাদের যে দুর্বলতা ধরা পড়েছে তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেয়া হয়েছে।

এই সূরার বিষয়বস্তুর ও মূল বক্তব্যের সাথে সূরা বাকারার সুসাদৃশ্য রয়েছে বলেই বাকারার পরেই এই সূরার স্থান স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক পটভূমি : (এক) ইসলামে বিশ্বাসীদেরকে সূরা বাকারায় পূর্বাহ্নেই যেসব বিপদ-মুছিবত ও অগ্নি পরীক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল তা পূর্ণমাত্রায় তীব্রতা সহকারে বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে যদিও ঈমানদারগণ জয়লাভ করেন কিন্তু মূলত এই যুদ্ধ ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতো। ইসলামের সাথে যারা শত্রুতা করতো, তারা সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধেই হতচকিত হয়ে গেলো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মনে হচ্ছিল সারা দুনিয়ার আক্রমণের স্বীকার মদীনার এ ক্ষুদ্র জনপদটি। হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমনে অর্থনৈতিক ভারসাম্য এমনিতেই নষ্ট, তার উপর যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিল।

(দুই) হিজরতের পর নবী করীম (সা) ইহুদীদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, বদরের যুদ্ধকালে সেই চুক্তি ভঙ্গ করে আহলে কিতাব তাদের

সকল সহানুভূতি মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী সেইসব মুশরিকদের প্রদর্শন করেছিল। বদর যুদ্ধের পর ইহুদীরা মদীনার মুনাফিক, কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও প্রতিশোধ গ্রহণে প্ররোচিত করতে থাকে। বনী নযীর গোত্রের নেতা "কাব ইবনে আশরাফ" তো এ ব্যাপারে নিজের বিরোধমূলক চেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা, বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদীনাবাসীদের সাথে ইহুদীদের শত শত বছরের বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের কোন পরোয়াই তারা করেনি। নবী করীম (সা) ইহুদী গোত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুষ্কর্মপরায়ণ "বনী কাইনুকা"-কে আক্রমণ করে পরাভূত করে মদীনা থেকে বের করে দেন। এই কারণে বাকী ইহুদীরা মদীনার মুনাফিক ও হিজাযের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলামের জন্য চারিদিকে অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি করে, এমনকি নবী করীম (সা)-এর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হতে থাকে। এই সময় থেকে সাহাবাগণ মদীনার নিরাপত্তায় রাতদিন সশস্ত্র পাহারায় থাকতেন।

(তিন) বদরে পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। ইহুদীরা তা আরো তীব্রতর করলো। ফলে মাত্র একটি বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি সামরিক বাহিনী মদীনা আক্রমণ করলো। ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা হতে এক হাজার সৈন্য নবী করীম (সা)-এর সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পথে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের নেতৃত্বে তিন শত সৈনিক মদীনায় ফিরে আসলো। তার পরও মুসলিম সৈনিকদের সাথে মুনাফিকদের ছোট একটি দল ছিল। যুদ্ধ চলতে থাকাকালেই মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই তারা করেছিল। এই প্রথমবার জানা গেল যে, মুসলমানদের নিজেদের ঘরেই যে এত সংখ্যক আস্ত-শত্রু রয়েছে এবং তারা বহিঃশত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরই ভাই-বন্ধুদের ক্ষতি করতে বদ্ধপরিকর।

(চার) ওহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সাময়িক পরাজয়ের মূলে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কিন্তু মুসলমানদের দুর্বলতার অংশও

কম ছিল না। মুসলমানদের সৈন্যদলটি, যাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণতা লাভ করেনি, তাদের কার্যক্রমে কিছু দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। তাই যুদ্ধের পর যুদ্ধকালীন সম্পূর্ণ ঘটনাকে সামনে রেখে বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করা এবং এতে মুসলমানদের কার্যক্রমে ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব দুর্বলতা ধরা পড়ে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। আলোচ্য সূরায় তাই করা হয়েছে। যুদ্ধ অবসানের পর দুনিয়ার সেনাধ্যক্ষগণের সমালোচনা থেকে আল-কুরআনের সমালোচনা যে কত স্বতন্ত্রধর্মী তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ব্যাখ্যা : (ক) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহ্কে ভয় কর।"

تَقْوٰى (তাকওয়া) শব্দটি وِقَايَةٌ থেকে এসেছে। এর অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, দূরে থাকা ও ভয় করা। সাধারণভাবে মনে আল্লাহ্র ভয় থাকাকে তাকওয়া বলে।

আল্লাহ্ তায়ালাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তার আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া চলবে না, তাঁকে সদা স্মরণ করতে হবে। হযরত আনাস (রা)-এর ঘোষণা এই যে, মানুষ আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করার দাবি পূরণ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত করে।

আমাদের সমাজে বাহ্যিক বেশভূষাকে পরহেযগারী বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য বাহ্যিক বেশভূষারও একটা গুরুত্ব আছে। আসলে তাকওয়া হলো মনের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকা। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের কলবের দিকে ইশারা করে বলেন : اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا - তাকওয়া হলো এখানে (অন্তরে)।"

আতীয়া আস-সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে (বাহ্যত) যেসব কাজে গুনাহ নেই (অথচ যাতে পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে) তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে উক্ত এ আয়াত فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (৬৪ : ১৬) আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, মানুষ সাধ্যানুসারে আল্লাহকে ভয় করবে। হযরত আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি। মানুষ যেন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, এমনকি নিজের উপরও যেন ন্যায়ের নির্দেশ জারী করে। নিজের পিতামাতা, ছেলেমেয়ে ও কাজের লোকদের প্রতি ইনসাফ কায়েম করে।

(খ) وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ "তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।" আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তোমরা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ কর। সারা জীবন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, যাতে মৃত্যুও তার উপরই হয়। মহান প্রভুর নীতি এই যে, মানুষ নিজের জীবন যে ধর্মের উপর পরিচালিত করে, ঐ ধর্মের উপরই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন। এই ধর্মের উপরই কিয়ামতের দিন তাকে উত্থিত করা হবে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায় সে যেন আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের উপর ঈমান রাখে এবং লোকদের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করে যেরূপ ব্যবহার সে নিজের জন্য তাদের কাছ থেকে আশা করে। এছাড়া আর একটি ভাবার্থও করা হয়েছে, "আমি জিহাদে শত্রুদের দিকে পিঠ করে মৃত্যুবরণ করবো না।"

মুসলমান শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত কারও কোন উপায় নাই। তাই হযরত ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন :

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।" (সূরা বাকারা : ১৩১)

(গ) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا "তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

আল্লাহর রজ্জু বলতে দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। এটি এমন একটি রজ্জু, যা আল্লাহর সাথে ঈমানদারগণের সম্পর্ক জুড়ে দেয়। আবার ঈমানদারগণকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে এক জামায়াতবদ্ধ করে। দীন ইসলাম নামের রজ্জু হলো আল্লাহর কুরআন।

حَبْلُ اللّٰهِ هُوَ الْقُرْاٰنُ "আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে আল-কুরআন।" (ইবনে কাসীর) তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর কুরআনের অনুসরণ কর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীস, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন। (১) তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (২) তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে, কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। (৩) তোমরা মুসলমান শাসকের সহায়তা করবে। একতাবদ্ধ জীবনে শয়তান ভয় পায়। আর বিচ্ছিন্ন জীবনে বান্দাকে শয়তান প্ররোচিত করে এবং আলোর পথ থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। আল-কুরআনে আল্লাহ্ আরো বলেন :

وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে নিশ্চয় সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত হবে।" (সূরা আল ইমরান : ১০১)

وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ـ

"তোমরা মূলত একই দলভুক্ত, আর আমি তোমাদের প্রভু। সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় করো।" (সূরা মুমিনূন : ৫২)

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ.

"অতএব তোমরা নামায কায়ে কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে (তাঁর রজ্জুকে) শক্তভাবে ধারণ কর।" (সূরা হজ্জ : ৭৮)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

"আল্লাহ্ তো সেসব লোককে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।" (সূরা আস-সফ : ৪)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

“তোমরা সেসব লোকের মত হয়ো না যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।” (সূরা আল ইমরান : ১০৫)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

“যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর দীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেবেন।” (সূরা আন-নিসা : ১৭৫)

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا.

“তবে যারা তওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে ও আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করেছে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজেদের দীনকে খালেস করে নিয়েছে, এমন সব লোকই মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদেরকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন।” (সূরা আন-নিসা : ১৪৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ.

“যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে ইসলামের বন্ধন থেকে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল।” (আবূ দাঊদ)

(ঘ) وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا.

“তোমরা আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, তখন তিনিই তোমাদের মন মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।”

আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাহদেরকে তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, জাহিলিয়াতের যুদ্ধে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ যুদ্ধ ও কঠিন শত্রুতা বিরাজ করছিল। গোত্রদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করার পর মহান আল্লাহ তাদের মনকে এমনভাবে মিলিয়ে দিলেন যে, তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। এই ধরনের আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন মদীনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব।

هُوَ الَّذِيْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ.

"তিনিই নিজের সাহায্য দ্বারা এবং মুমিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেছেন।"

(সূরা আনফাল : ৬২-৬৩)

আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিতেছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা জাহান্নামের একেবারে গভীর গহ্বরে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তথায় তোমাদেরকে প্রবেশ করিয়ে দিত। ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ঐ জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

(ঙ) كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. "এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।"

এই আলামতগুলো দেখে তোমরা নিজেরাই অনুমান করতে পার কিসে তোমাদের পরিত্রাণ– আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে, না পূর্বের জাহিলিয়াতের মধ্যে? তোমাদের আসল কল্যাণকামী কে– আল্লাহ ও রাসূল (সা) না ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিক?

(চ) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা নেকী ও

মঙ্গলের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই সফলকাম হবে।"

প্রত্যেকের উপরই সত্যের প্রচার বা কল্যাণের দিকে আহ্বান করা ফরয। কিন্তু তারপরও একটি দলের এ কাজে লেগে থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "তোমাদের মধ্যে যে কেউ কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তাকে হাত দ্বারা বাধা দেয়। যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তবে যেন মুখ (কথা) দ্বারা বাধা দেয়। যদি তাও করতে না পারে, তবে যেন অন্তর দ্বারা (কাজটিকে) ঘৃণা করে এবং এটাই হচ্ছে সবচাইতে দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।"

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ - (ترمذى)

অর্থ : হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ ও পাপ কাজ থেকে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহ আযাব নাযিল করে শাস্তি দিবেন। অতঃপর তোমরা তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিযী)

তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করো না। ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা তোমরা ত্যাগ করো না। একটি দল এ কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে, তারাই সফলতা লাভ করবে। এই সফলতা থেকে তুমি আর আমি যেন বাদ পড়ে না যাই সেজন্য সর্বদা এ ফরয কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে নিয়োজিত থাকা চাই।'

শিক্ষা : ১। আমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং পূর্ণ মুসলমান হয়ে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

২। সবাই একতাবদ্ধ হয়ে মযবুতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে সিসাঢালা প্রাচীরের মত আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে হবে।

৩। ইসলামী সংগঠনভুক্ত হওয়ার পর ইতিপূর্বেকার পরস্পর শত্রুদেরও হৃদয়গুলো আল্লাহ তাঁর রহমতে মিলিয়ে দেন। ফলে তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই।

৪। সমাজে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এরাই আল্লাহর দরবারে সফলকাম হবে।

বাস্তবায়ন : এ দারসে শিক্ষা হিসাবে যে চারটি দফা তুলে ধরা হয়েছে, আমরা যেন আমাদের সমাজের সকল লোককে এ শিক্ষাগুলো জানিয়ে দিতে পারি এবং আমরা একদল লোক সংগঠিত অবস্থায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করতে পারি। এই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। আমীন, ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ৩

ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহ্ তায়ালার একটি মূলনীতি

২৯. সূরা আল-আনকাবূত

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৬৯, রুকূ-৭

আলোচ্য আয়াত নং- ১-৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) الٓمّٓ ج (٢) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ ـ (٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ. (٤) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (১) আলিফ-লাম-মীম। (২) লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে, 'আমরা ঈমান এনেছি', এটুকু বললেই তারা ছাড়া (নিষ্কৃতি) পেয়ে যাবে? তাদেরকে কি কোন পরীক্ষা করা হবে না? (৩) অথচ আমরা তো তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? (৪) যেসব লোক খারাপ কাজ করছে তারা কি একথা মনে করে নিয়েছে যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে। তারা খুব খারাপ ফায়সালা করেছে।

শব্দার্থ : اَحَسِبَ - মনে করেছে কি, اَلنَّاسُ - মানুষ, يُّتْرَكُوْا - তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, يَقُوْلُوْا - তারা বলবে, اٰمَنَّا - আমরা ঈমান

এনেছি, لَا يُفْتَنُوْنَ - তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না, وَ - অথচ, لَقَدْ - নিশ্চয়ই, فَتَنَّا - আমরা পরীক্ষা করেছি, قَبْلِهِمْ - তাদের পূর্বে, فَلَيَعْلَمَنَّ - অবশ্যই জেনে নিবেন, صَدَقُوْا - সত্য বলছে, لَيَعْلَمَنَّ - জেনে নিবেন অবশ্যই, اَلْكٰذِبِيْنَ - মিথ্যাবাদীদেরকে, اَمْ - অথবা, حَسِبَ - মনে করেছে, يَعْمَلُوْنَ - কাজ করছে, اَلسَّيِّاٰتِ - মন্দ, يَسْبِقُوْنَا - আমাদেরকে তারা ছাড়িয়ে যাবে, سَاءَ - কত খারাপ, يَحْكُمُوْنَ - তারা ফায়সালা করেছে।

নামকরণ : এই সূরার চতুর্থ রুকূর একচল্লিশ আয়াত–

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ.

উল্লেখিত 'আনকাবূত' শব্দটিকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আনকাবূত অর্থ– মাক্‌ড়সা।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : এই সূরার ৫৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সূরাটি মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এতে উল্লেখিত বিষয়াদি ও আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকেও এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এ সূরায় হিজরতের কথা উল্লেখ আছে। মুসলমানদেরকে হিজরত করতে বলা হয়েছে। মদীনায় হিজরত অধিক প্রসিদ্ধ, তাই কোন কোন তফসীরকার মদীনায় হিজরত মনে করে প্রথম দশটি আয়াত মাদানী, বাকী অংশ মাক্কী বলেছেন। মুসলমানগণ মদীনায় হিজরতের পূর্বে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সূরাটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এটি মাক্কী জীবনের শেষ সূরা নয়, বরং হাবশায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ সূরা বলেই প্রতিভাত হয়।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : সূরাটি নাযিলের সময় মক্কা শরীফে কাফেররা পূর্ণ শক্তিতে মুসলমানদের উপর কঠোর নির্যাতন ও ইসলামের বিরোধিতা করছিল। এই সূরার মাধ্যমে একদিকে আল্লাহ তায়ালা সত্যিকার নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প, সাহস, হিম্মত ও অনমনীয়

মনোভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, অপরদিকে দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে লজ্জা দিতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে মক্কার কাফেরদেরকে কঠোর ভাষায় শাসন করা হয়েছে এই বলে যে, সত্যের বিরোধীরা চিরকাল এ অপরাধের দরুন যে মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, তারা যেন নিজেদের জন্য সেই পরিণতিকে ডেকে না আনে।

নও মুসলিম যুবকদেরকে তাদের পিতামাতা চাপ সৃষ্টি করে বলতো, তোমাদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনও তো পিতা-মাতার হক সবচাইতে বেশী বলে ঘোষণা করেছে। কাজেই এখন আমরা যা কিছু বলি তা মেনে নাও। আযাব আর সওয়াব যা কিছু হয় সেজন্য আমরা দায়ী। তোমরা ইসলাম ও এ ব্যক্তিকে (হযরত মুহাম্মদ সা.) ত্যাগ কর। আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করলে আমরা অগ্রসর হয়ে বলবো, এ বেচারাদের কোন দোষ নেই। আমরাই এদেরকে ঈমান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছি। কাজেই ধরতে হলে আমাদেরকে ধরুন। ১২-১৩ নং আয়াতে এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

অতীত কালের নবী-রাসূলগণের উপর কত দীর্ঘকাল পর্যন্ত কঠিন মুসীবত ও নির্যাতন চলেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র তরফ থেকে তাদের প্রতি সাহায্য নেমে আসে। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। তবে কঠিন পরীক্ষার একটা পর্যায় অতিবাহিত করা একান্ত আবশ্যক। মুসলমানদেরকে এ শিক্ষাদানের সাথে সাথে কাফেরদেরকেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দিক থেকে পাকড়াও করায় যদি বিলম্ব হয়ে থাকে, তবে পাকড়াও যে হবে না– একথা মনে করো না। অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর নিদর্শন তোমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছে এবং আল্লাহর নবীগণ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। মুসলমানদেরকে আরও হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, যুলুম-নির্যাতন তোমাদের সহ্য সীমার অধিক হয়ে পড়লে, ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে বাড়ীঘর ত্যাগ করে চলে যাও। আল্লাহর দুনিয়া তো ছোট নয়। যেখানে নির্বিঘ্নে আল্লাহর বন্দেগী করতে পারবে সেখানেই চলে যাও। তারপর তাওহীদ ও পরকাল এ দু'টো মহাসত্যকে দলীল-প্রমাণ দিয়ে

কাফেরদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিরকের প্রতিবাদ ও তার বাতুলতা প্রমাণ করা হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শন আমাদের নবীর যাবতীয় শিক্ষার সত্যতাই তোমাদের সামনে প্রমাণ করছে।

ব্যাখ্যা : (ক) الٓمٓ। - এই তিনটি হুরূফে মুকাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষর। এই অক্ষরগুলোর অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষর পবিত্র কালামে মজীদের অন্য কতক সূরাতেও আছে।

(খ) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ -

"লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে, 'আমরা ঈমান এনেছি', এটুকু বললেই তারা ছাড়া (নিষ্কৃতি) পেয়ে যাবে? তাদেরকে কি কোন পরীক্ষা করা হবে না?"

ঈমান কেবল মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার নাম নয়, বরং ঈমান হলো একটা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ আকীদা। একটা ঝুঁকিপূর্ণ আমানত, এমন এক জিহাদ যা জয় করতে ধৈর্যের প্রয়োজন এবং এমন এক সাধনা যার সাফল্যের জন্য সহিষ্ণুতা অপরিহার্য। সুতরাং এটা যথেষ্ট নয় যে, 'আমি ঈমান এনেছি' এ দাবি করেই পার পেয়ে যাবো। এ দাবি করার পর যখন পরীক্ষা আসবে তখন তাকে সেই পরীক্ষায় এমনভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে যে, তার ঈমানে কিছু মাত্র ভেজাল অবশিষ্ট থাকবে না এবং কিছু মাত্র দুর্বলতা আসবে না। যেমন স্বর্ণ আগুনে পোড়ালে তার খাদ পৃথক হয়ে যায়। তদ্রূপ আল্লাহর পরীক্ষায় ঈমান ও বেঈমানকে পৃথক করে, ঈমানকে খাঁটি করে তোলে। ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহর চিরস্থায়ী একটি নীতি।

ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের উপর যখন আবার এক কঠিন বিপদ নেমে আসলো তখন বলা হলো :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

"তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা বেহেশতে চলে যাবে, অথচ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে কে ধৈর্যধারণকারী– তা তো

আল্লাহ এখনও প্রকাশ করেননি।" (আলে ইমরান : ১৪২, আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য বাকারা : ২২৪, আলে ইমরান : ১৭৯, তওবা : ১৬, মূলক : ২, মুহাম্মদ : ৩১ নং আয়াত দেখুন)।

যে অবস্থায় আয়াতটি নাযিল হয়েছিল, তা হলো মক্কায় যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করতো, তার উপরই বালা-মুসীবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এই অবস্থায় মক্কা শহরের গোটা পরিবেশেই ভয় ও ত্রাস বিরাজিত ছিল। এই কারণে বহু সংখ্যক লোক নবী করীম (সা)-এর সততার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় পেতো। কিছু লোক ঈমান আনার পর যখন দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণার স্বীকার হয়ে সাহস-হিম্মত হারিয়ে ফেলতো ও কাফেরদের সামনে নতি স্বীকার করে বসতো, এই অবস্থায় মজবুত ঈমানদার সাহাবীদের দৃঢ় সংকল্পে কোন ব্যতিক্রম না হলেও মানবীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবিতে তাদের মধ্যে প্রায়শ একটা কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হতো। হযরত খাব্বাব (রা)-এর একটি বর্ণনায় এই করুণ কাতর অবস্থার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

হযরত খাব্বাব (রা) বলেন, "একদিন আমি দেখলাম, নবী করীম (সা) কা'বা ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে আছেন। আমি উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না?" এই কথা শুনামাত্র নবী করীম (সা)-এর মুখমণ্ডল আবেগে রক্ত বর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদারদের উপর তো এর চেয়েও অধিক কঠোর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তন্মধ্যে কোন কোন ঈমানদারকে ধরে এনে যমীনের গর্তে কোমর পরিমাণ গেড়ে দিয়ে তার মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। কারও গায়ের গোশত লোহার চিরুনী দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হতো। এইসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকদিগকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে রাখা। আল্লাহর কসম! ঈমানদারদের এই ত্যাগ ও সাধনা পূর্ণ হবেই। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হবে যে, এক ব্যক্তি সানয়া হতে হাদরামাওত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সফর করবে এবং এ সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারও ভয় তাকে করতে হবে না।

(গ) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.

"অথচ আমরা তো তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী?"

যে লোকই ঈমানের দাবি করেছে, তাকেই কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তারা যখন কোন পরীক্ষা ব্যতীত কিছুই পায় নাই, তখন তোমাদের আর কি বিশেষত্ব রয়েছে যা দ্বারা তোমাদেরকে বিনা পরীক্ষায় শুধু ঈমানের মৌখিক দাবির ভিত্তিতে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় দানে ধন্য করবেন? পরীক্ষার আগেই আল্লাহ জানেন কার মন কেমন এবং কার মধ্যে কি যোগ্যতা আছে? পরীক্ষার মাধ্যমে তা বাস্তব জগতে জ্ঞাত ও উন্মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ পরীক্ষার আগে যা জানতো না, পরীক্ষার পর তা জানতে পারে। ফলে আল্লাহ তায়ালা যে হিসাব নেবেন ও কর্মফল দেবেন, তা শুধু নিজের জানার ভিত্তিতেই নয়, বরং মানুষের বাস্তব কাজের ভিত্তিতে প্রকাশ্যভাবে দেবেন।

কোন ব্যক্তির মধ্যে হয়তো কোন কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে; কিন্তু তা যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যত প্রকাশিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনসাফ ও সুবিচারের দৃষ্টিতে সে কোনরূপ প্রতিফল পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক ব্যক্তির দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার যোগ্যতা আছে; কিন্তু তা কার্যত যতক্ষণ পর্যন্ত প্রদর্শিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনসাফ ও সুবিচারের দৃষ্টিতে সে কোনরূপ প্রতিফল বা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। এটা আল্লাহ তায়ালার ইনসাফের নীতির সম্পূর্ণ খেলাপ। তাই আমরা আল্লাহর এই কথাটুকুর তরজমা করেছি : "আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"

(ঘ) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَاۤءَ مَايَحْكُمُوْنَ -

"যেসব লোক খারাপ কাজ করছে তারা কি একথা মনে করে নিয়েছে যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে। তারা খুব খারাপ ফায়সালা করেছে।"

কোন দুরাচারীর একথা চিন্তা করা উচিত নয় যে, সে আল্লাহ্র নাগালের বাইরে চলে গেছে এবং আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিস্তার পেয়ে গেছে। এ ধরনের ধারণা যে ব্যক্তি পোষণ করে, সে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। কুরাইশ বংশের যালিম সরদারদের লক্ষ্য করেই কথাটি বলা হয়েছে, যারা ইসলামের বিরোধিতায় এবং ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের উপর যুলুম-অত্যাচার চালাবার ব্যাপারে খুবই অগ্রসর ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জাহল, উতবা, শাইবা, উকবা এবং হানযালা প্রমুখের নাম এ পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলমানদের এই কঠিন পরীক্ষার সময় ধৈর্য, সহ্য ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করার উপদেশ দানের পর যুলুম ও নির্যাতনকারীদেরকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে।

এর আর একটি অর্থ হতে পারে : আমাদের পাকড়াও এড়িয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে বলে মনে করেছো? মূল শব্দ হলো يَسْبِقُوْنَا - আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাবে। তারা যে বাড়াবাড়ি করছে, আমরা বুঝি তাদেরকে পাকড়াও করতে পারবো না? তারা পালিয়ে আমার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে, অথচ আমার ক্ষমতার বাইরে এমন এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও নেই যেথায় তারা আশ্রয় পাবে।

শিক্ষা : ১। ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহর একটি চিরস্থায়ী নীতি। ঈমানের পরীক্ষা মুমিনের ঈমানকে খাঁটি ও মজবুত করে তোলে।

২। ঈমানের দাবিদারদের পরীক্ষা আসবে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩। যার ঈমান যত মজবুত তার পরীক্ষা তত কঠিন। পরীক্ষার মাধ্যমেই তো আল্লাহ তায়ালা দেখে নিবেন ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

৪। আল্লাহ তায়ালা মানুষের আমলের যে হিসাব নেবেন ও কর্মফল দেবেন, তা শুধু নিজের জানার ভিত্তিতেই নয়, বরং মানুষের বাস্তব কাজের ভিত্তিতে প্রকাশ্যভাবে দেবেন।

৫। অধিক সংশোধনের জন্য মানুষকে বিপদের সম্মুখীন করে আল্লাহ পরীক্ষা করেন।

৬। বিপদ ও পরীক্ষায় যারা আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

৭। যারা সর্বদা গুনাহর কাজে লিপ্ত তারা কখনও আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না।

বাস্তবায়ন : আমাদের মুসলিম সমাজে প্রত্যেকেই নিজকে ঈমানদার বলে দাবি করে। অথচ ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহর একটি নীতি, একথা সকলে জানে না। ঈমানদার সকলকেই ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। পরীক্ষার দ্বারা ঈমান খাঁটি ও মজবুত হয়। এই কথাগুলো সমাজে ঈমানের দাবিদারকে জানিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ্‌ তায়ালা যেন আমাদের সকলকে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তৌফিক দান করেন। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ৪

উন্নত মানের মুমিনের পরিচয় ও তাদের জান্নাতুল ফিরদাওসের ওয়াদা

২৩. সূরা আল-মুমিনূন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১১৮, রুকূ-৬

আলোচ্য আয়াত নং- ১-১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ لا (٢) الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ لا (٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ لا (٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ لا (٥) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ لا (٦) اِلاَّ عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ج (٧) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ج (٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ لا (٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ م (١٠) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ لا (١١) الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (১) "নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত হয়,

(৩) বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে, (৪) যাকাত দানে সক্রিয় থাকে, (৫) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, (৬) নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া, এতে তারা তিরস্কৃত হবে না, (৭) তবে যারা এর বাইরে অন্যকে কামনা করবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী, (৮) যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে (৯) এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের হেফাযত করে, (১০) তারাই হবে অধিকারী, (১১) যারা নিজেদের অধিকার হিসাবে ফিরদাওস লাভ করবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

শব্দার্থ : قَدْ - নিশ্চয়, اَفْلَحَ - সফল হয়েছে, اَلْمُؤْمِنُوْنَ - মুমিনগণ, اَلَّذِيْنَ - যারা, هُمْ - তারা, فِيْ صَلَاتِهِمْ - তাদের নামাযে, خٰشِعُوْنَ - বিনয়ী-নম্র, ভীত, اللَّغْوِ - বেহুদা কথা, কাজ, مُعْرِضُوْنَ - বিরত থাকে, لِلزَّكٰوةِ - যাকাত দানে, فٰعِلُوْنَ - তৎপর বা সক্রিয় থাকে, لِفُرُوْجِهِمْ - তাদের লজ্জাস্থানগুলোকে, حٰفِظُوْنَ - হেফাযতকারী, اِلَّا - ব্যতীত, عَلٰى - উপর, اَزْوَاجِهِمْ - তাদের স্ত্রীদের, اَوْ - বা, مَا - যা, مَلَكَتْ - মালিক হয়েছে, اَيْمَانُهُمْ - তাদের ডান হাত (অর্থাৎ ক্রীতদাসী), فَاِنَّهُمْ - নিশ্চয় তারা, غَيْرُ - নয়, مَلُوْمِيْنَ -নিন্দনীয়, فَمَنْ - তবে যে, ابْتَغٰى -চায়, وَرَاءَ - বাইরে, ذٰلِكَ - এর, فَاُولٰئِكَ - সেক্ষেত্রে ঐসব লোক, هُمْ - তারা, الْعٰدُوْنَ - সীমালংঘনকারী, اَلَّذِيْنَ - যাদের (বিশেষ গুণ হলো), هُمْ- তারা, لِاَمٰنٰتِهِمْ - তাদের আমানতসমূহের, عَهْدِهِمْ - তাদের ওয়াদায়, رٰعُوْنَ - সংরক্ষণকারী, عَلٰى - ক্ষেত্রে, صَلَوٰتِهِمْ - তাদের নামাযসমূহের يُحَافِظُوْنَ - তারা হেফাযত করে, – اُولٰئِكَ ঐসব লোক, هُمْ - তারাই, الْوٰرِثُوْنَ - (সেই) উত্তরাধিকারী, يَرِثُوْنَ - উত্তরাধিকারী হবে, اَلْفِرْدَوْسَ - ফিরদাওসের, فِيْهَا - তার মধ্যে, خٰلِدُوْنَ - চিরস্থায়ী হবে।

নামকরণ : সূরার প্রথম আয়াত قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ.-এর ‘আল-মুমিনূন’ শব্দ দ্বারা এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরার বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু উভয় হতে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা রাসূলে কারীম (সা)-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে কাফেরদের সঙ্গে যখন প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছিল তখন নাযিল হয়। কাফেরদের যুলুম ও নির্যাতনের মাত্রা তখনও বেশী জোরদার হয়ে উঠেনি। ৭৫ ও ৭৬ নং আয়াতে প্রমাণিত যে, মক্কার কঠিনতম দুর্ভিক্ষের সময় এ সূরা নাযিল হয়। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) বর্ণিত হাদীসমতে এ সময় হযরত ওমর (রা) ঈমান এনেছিলেন। ওমর (রা) বলেন, সূরাটি তাঁর সামনেই নাযিল হয়। তিনি নিজে নবী কারীম (সা)-এর উপর ওহীর বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখতে পান। ওহীর বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন হলে মহানবী (সা) বলেন, এইমাত্র আমার প্রতি এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মানদণ্ডে কেউ উত্তীর্ণ হলে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পড়ে শুনান। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও হাকেম)

আলোচ্য বিষয় : এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো রাসূলে কারীম (সা)-এর আনুগত্য করার প্রতি আহ্বান। যারা নবী (সা)-এর কথা মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী সৃষ্টি হচ্ছে। এ সকল গুণসম্পন্ন লোকেরাই আখেরাতে সাফল্য অর্জন করবে।

মানুষের জন্ম, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিশ্ব জাহানের অন্যান্য নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে– এ কথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া যে, মহানবী (সা) তাওহীদ ও আখেরাতের যে চিরন্তন সত্যগুলো তোমাদেরকে মেনে নিতে বলছেন, তোমাদের সত্তা এবং এই বিশ্বব্যবস্থা সেগুলোর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। নিম্নে যুক্তিসহকারে শ্রোতাদেরকে কিছু কথা বুঝানো হয়েছে।

এক. আজ তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ পোষণ করছো ও আপত্তি উত্থাপন করছ– সেগুলো নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে যেসব নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছিলেন, যাদেরকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে থাক, তাঁদের সবার যুগে তাঁদের বিরুদ্ধে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা একই রূপ আপত্তি তুলেছিল। এখন দেখো ইতিহাসের শিক্ষা কি, আপত্তি উত্থাপনকারীরা সৎপথে ছিল, না নবীগণ ?

দুই. মুহাম্মদ (সা) তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে যে শিক্ষা দিচ্ছেন, এই একই শিক্ষা প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলগণ দিয়েছেন। তার বাইরে এমন কোন অভিনব জিনিস আজ পেশ করা হচ্ছে না– যা দুনিয়াবাসী এর আগে কখনও শোনেনি।

তিন. যেসব জাতি নবীদের কথা শোনেনি এবং নবীদের বিরোধিতায় অটল ছিল তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।

চার. আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক যুগে একই দীন এসেছে এবং সকল নবী-রাসূল একই জাতি ও উম্মাহভুক্ত ছিলেন। সেই একমাত্র দীনটি ব্যতীত তোমরা দুনিয়ায় যেসব বিচিত্র ধর্মমত দেখতে পাচ্ছো, এগুলো সবই মানুষের মনগড়া। এর কোনটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়।

এরপর লোকদেরকে এই কথা বলা হয়েছে যে, পার্থিব সমৃদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এমন জিনিস নয় যা কোন ব্যক্তির সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার আলামত হতে পারে। এর দ্বারা বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তার নীতি ও আচরণ আল্লাহর কাছে প্রিয়।

অনুরূপভাবে কারো গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার ও তার নীতির প্রতি অসন্তুষ্ট। আসল জিনিস হচ্ছে মানুষের ঈমান, আল্লাহভীতি ও সততা। এর উপরই মানুষের আল্লাহর প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়া নির্ভর করে। কথাগুলো এজন্য বলা হয়েছে যে, সে সময় নবী করীম (সা)-এর দাওয়াতের বিরোধিতা করতো তারাই ছিল মক্কার বড় বড় নেতা ও সরদার। তারা এবং তাদের প্রভাবাধীন লোকেরা আত্মম্ভরিতায় ভুগছিল এবং এ ভুল ধারণার শিকার হচ্ছিল যে, যাদের প্রতি আল্লাহর করুণাধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং যারা একাধারে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে, নিশ্চয় তাদের উপর আল্লাহ ও দেবতাগণ সন্তুষ্ট আছে। আর এ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত মুহাম্মদের (সা) অনুসারীদের অবস্থাই তো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এদের সাথে নেই এবং দেবতাদের ক্রোধানলে তো এরা পড়েই আছে।

তারপর মক্কাবাসীদেরকে নবুয়াতের উপর আস্থাশীল করার জন্য বিভিন্নভাবে

চেষ্টা করা হয়েছে; এমনকি তখনকার দুর্ভিক্ষকে সতর্ক সংকেত হিসাবে বর্ণনা করে সাবধান হয়ে সংশোধনের পথ অনুসরণের জন্য বলা হয়েছে।

বিশ্বপ্রকৃতি ও তাদের নিজস্ব সত্তার মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের নিদর্শনাবলী তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জ্ঞান বিবেকের চোখ খুললেই এই সকল নিদর্শন তাদের কাছে ধরা পড়বে।

তারপর নবী করীম (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অন্যরা তোমার সাথে যে ব্যবহার করুক না কেন তুমি ভালভাবেই তাদের প্রত্যুত্তর দাও। মন্দের জবাব যেন মন্দ না হয়।

বক্তব্য শেষে সত্য বিরোধীদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তোমরা সত্যের আহ্বায়ক ও অনুসারীদের সাথে যা করছো সেজন্য তোমাদেরকে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

দারসে নির্বাচিত ১১টি আয়াতের মধ্যে প্রথম ৯টি আয়াতে মুমিনদের যে গুণাবলীর কথা উল্লেখিত হয়েছে, যেসব লোক এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী হবে তারাই সাফল্য লাভ করবে বা তাদেরকে সফল বলা হবে। আর সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ ১০ ও ১১ নং আয়াতে তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাওস দানের কথা বলা হয়েছে। এই গুণসম্পন্ন মুমিনরা ফিরদাওসের উত্তরাধিকারী হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা : (১) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ।"

মুমিন বলতে তাদের বুঝানো হয়েছে যারা মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তাঁকে অনুসরণীয় নেতা ও পথপ্রদর্শক মেনে নিয়েছে এবং তাঁর দেয়া জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে রাজী হয়েছে।

মূল শব্দ হচ্ছে 'ফালাহ'। ফালাহ অর্থ সাফল্য ও সমৃদ্ধি। এই শব্দটি ক্ষতি, ঘাটতি, লোকসান-এর বিপরীতার্থক।

قَدْ اَفْلَحَ - "নিশ্চিতভাবে সফলতা লাভ করেছে।" এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে হলে যে পরিবেশে এ ভাষণ নাযিল হয়েছে তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য। তখন একদিকে ছিল ইসলাম বিরোধী

জাহিলী সরদারবৃন্দ। তাদের প্রচুর ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল। অপরদিকে ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীরা পূর্ব থেকেই ছিল গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত। এ অবস্থায়ও যখন বলা হয়েছে, "নিশ্চিতভাবে মুমিনরা সফলকাম হয়েছে"– বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে, তখন এ থেকে আপনা-আপনি বুঝা যাচ্ছে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদণ্ড ভুল। তোমাদের সাময়িক ও সীমিত সমৃদ্ধিকে সাফল্য মনে করছো, আসলে তা সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও বিফল মনে করছো তারাই আসলে সফলকাম ও সার্থক। এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর সত্যের দাওয়াতকে অবহেলা করে তোমরা আসলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ তার পরিণাম তোমাদেরকে এ দুনিয়ায় এবং পরবর্তী জীবনেও ভোগ করতে থাকবে।

এটি হচ্ছে এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। এই একটি কথাকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেয়ার জন্যই সূরার সমগ্র ভাষণটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

(২) اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خٰشِعُوْنَ. - "যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত হয়।"

মূল শব্দ হচ্ছে 'খুশূ'। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কারো সামনে ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থার সম্পর্ক দেহ ও মন দুইয়ের সাথেই। মনের খুশূ হচ্ছে– মানুষ কারও শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব, প্রতাপ ও পরাক্রমশীলতার দরুন তার সামনে সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ হচ্ছে– যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে থাকবে, অংগ-প্রত্যংগ বিনম্র হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত থাকবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয়, তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। নামাযে খুশূ বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের

আসল প্রাণ। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী কারীম (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নাড়াচাড়া করতে দেখে বললেন, "যদি তার মনে "খুশূ" থাকতো, তাহলে তার দেহেও খুশূর সঞ্চার হতো।"

খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ আপনা-আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়। শরীয়াতে নামাযের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় নামাযের কর্মকাণ্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে 'নামাযী যেন ডানে-বাঁয়ে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে না তাকায়। হানাফী ও শাফিয়ীদের মতে দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম করা উচিত নয়। মালেকীগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত। নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার পরিধেয় বস্ত্র গুটানো, ঝাড়া বা তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে নিষেধ করা হয়েছে। গর্বিত ভংগীতে খাড়া হওয়া, অধিক জোরে কুরআন পড়া, নামাযের ভেতর ঢেকুর তোলা, জোরে জোরে আড়মোড়া ভাঙ্গা ও তাড়াহুড়া করে টপাটপ নামায পড়া বেয়াদবী।

নামাযের প্রত্যেকটি কাজ ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে করতে হবে। একটি কাজ পুরোপুরি শেষ না হতেই অন্য কাজ আরম্ভ করা যাবে না। নামাযে কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকলে এক হাতে তা সরিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু বারবার হাত নাড়াচাড়া অথবা দু'হাত একসাথে ব্যবহার করা যাবে না।

বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে নামাযের আভ্যন্তরীণ আদবের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নামাযের মধ্যে অবান্তর কথা, অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা, হিসাব-নিকাশ মিলানো– এসব খেয়াল শয়তান আমাদের নামাযকে নষ্ট করার জন্য মনের মধ্যে হাযির করে। যখনই অনুভূতি জাগ্রত হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৩) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - "যারা বাজে কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে।"

لَغْوِ - অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন, কথা ও কাজ, যাতে কোন ফল পাওয়া যায় না। যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই। যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভাল নয়, সেগুলো সবই বাজে কাজের অন্তর্ভুক্ত।

مُعْرِضُوْنَ - বিরত থাকে, উপেক্ষা করে, দূরে থাকে, অংশগ্রহণ করে না। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে, তারা বাজে কথায় কৌতূহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথা বা কাজ চলতে থাকে, তাতে অংশগ্রহণ করে না, মুখামুখী হলেও এড়িয়ে যায় বা উপেক্ষা করে চলে যায়। এ কথাটিকেই সূরা আল-ফুরকানে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا -

"এবং তারা অর্থহীন বাজে ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে নিজ মর্যাদা রক্ষা করে তা পরিহার করে চলে যায়।" (আল-ফুরকান ঃ ৭২)

এ ছোট বাক্যটিতে যা বলা হয়েছে তা আসলে মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর একটি। মুমিনগণ সর্বদা সময়ের মূল্য দেয় এবং দায়িত্ব পালনে সর্বদা সজাগ থাকে। সে এ দুনিয়ার জীবনটাকে একটা পরীক্ষাক্ষেত্র মনে করে। জীবন, বয়স, সময় আসলে নির্দিষ্ট করে দেয়া একটা মেয়াদ। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই এ নির্দিষ্ট মেয়াদটি বেঁধে দেয়া হয়েছে। যে ছাত্রটি পরীক্ষার হলে বসে প্রশ্নের জবাব লিখে চলছে সে অনুভব করে যে, তার পরীক্ষার জন্য এ ঘণ্টা কয়টি তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী। এ অনুভূতির কারণে সে ঘণ্টাগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের সঠিক জবাব লেখার চেষ্টায় ব্যয় করে। সে একটি মুহূর্তও বাজে কাজে নষ্ট করতে চায় না। ঠিক তেমনি মুমিন ব্যক্তিও দুনিয়ার এ জীবনকালকে এমন কাজে খরচ করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর।

মুমিন হয় একজন শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। সে ফলদায়ক কথা বলতে

পারে, কিন্তু আজেবাজে গল্প-গুজব করা তার স্বভাব নয়। সে ব্যঙ্গ-কৌতুক ও হালকা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে, কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাশায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা মস্করা ও ভাঁড়ামি সহ্য করতে পারে না। সে সমাজ তো তার জন্য জেলখানা, যা গালিগালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপূর্ণ গানবাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়। আল্লাহ মুমিনকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে জান্নাতের একটি নেয়ামত সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন যে ঃ

لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً - "সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না।" (৮৮ ঃ ১১)

(৪) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ - "যারা যাকাত দানে সক্রিয় থাকে।"

আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের একাধিক অর্থ হয়। তার একটি হচ্ছে "পবিত্রতা- পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুদ্ধি" এবং দ্বিতীয়টি "বিকাশ সাধন" -কোন জিনিসের উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দূর করা এবং মৌল উপাদান ও প্রাণবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা। এ দু'টি অর্থ মিলে যাকাতের পূর্ণাঙ্গ ধারণা সৃষ্টি হয়। তারপর শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হলে এর দু'টি অর্থ হয়– এক, এমন ধন সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই, পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি যদি- يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে ঃ তারা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয়। এভাবে শুধুমাত্র সম্পদ দেবার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ - বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং আত্মার পরিশুদ্ধি, চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। নিজের জীবনের পরিশুদ্ধি ছাড়াও চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারা নিজেদেরকেও পরিশুদ্ধ করে এবং অন্যদেরকেও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যেও মৌল মানবিক

উপাদানের বিকাশ সাধন করে এবং বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা 'আল-আলায় বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى.

"সফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়েছে।" (৮৭ ঃ ১৪-১৫)

সূরা আশ-শামসে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

"সফলকাম হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পবিত্র করেছে এবং ব্যর্থ হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করেছে।" (৯১ ঃ ৯-১০)

এ দু'টি আয়াতের তুলনায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী। আর এ দু'টি আয়াত শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির উপর জোর দেয় এবং আলোচ্য আয়াতটিতে নিজের সত্তা ও সমাজ জীবন উভয়েরই পরিশুদ্ধি শামিল রয়েছে।

(৫) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ. - "যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।"

এর দু'টি অর্থ হয়। এক– নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে, উলঙ্গ হওয়া থেকে নিজকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খোলে না।

দুই– তারা নিজেদের সততা, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করে না এবং কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না। (আরও ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা নূর, ৩০-৩২ টীকা দেখুন)।

(৬) اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ.

“নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া, এতে তারা তিরস্কৃত হবে না; তবে যারা এর বাইরে অন্যকে কামনা করবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী।”

৫ নং আয়াতের সাথে এ দু'টি আয়াতের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। পূর্বের আয়াতের 'যারা লজ্জাস্থানের হেফাযত করে' বাক্যাংশ থেকে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তা হলো– পৃথিবীতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজও বহু লোকের মধ্যে এ ধারণা রয়েছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস। বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহওয়ালা লোকদের জন্য সংগত নয়।

'সফলতা অর্জনকারী মুমিনরা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে' বলে যদি বক্তব্য খতম করে দেয়া হতো তাহলে এ অর্থ করা যেতো যে, যারা লজ্জাস্থানের হেফাযত করে– তারা মালকোঁচা মেরে থাকে, তারা সন্যাসী ও যোগী এবং বিয়ে-শাদীর ঝামেলায় তারা যায় না। খৃস্টজগত আজ এ ধারণায় নিমজ্জিত। তাদের পাদ্রী পুরোহিতরা বিয়ে-শাদীর ঝামেলায় যায় না। আর এ থেকেই অসুস্থ যৌনচর্চা তাদের মধ্যে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে।

আল্লাহ তায়ালা প্রাসঙ্গিক বাক্যটি জুড়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বৈধ স্থানে বৈধভাবে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা নিন্দনীয় নয়। তবে কামপ্রবৃত্তির এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই নিন্দনীয়, গোনাহর কাজ।

লজ্জাস্থানের হেফাযত করার সাধারণ হুকুম থেকে দুই ধরনের স্ত্রীলোককে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এক. বিবাহিত স্ত্রীলোক; দুই. এমন দাসী যার ওপর মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ আয়াত থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় মালিকানাধীন দাসীর সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন বৈধ এবং বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয়, বরং মালিকানা। যদি এর জন্য বিয়ে শর্ত হতো তাহলে একে স্ত্রী থেকে আলাদা করে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিবাহিত হলে

সেও স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত হতো। তবে ইসলামে দাসপ্রথা চিরতরে বিলুপ্ত করা হয়েছে (এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোচনা তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল-মুমিনূনের ৭নং টীকায় রয়েছে। পাঠকগণ ৭ নং টীকা দেখুন)।

(৭) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ.

'যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে'। এখানে 'আমানত' শব্দটি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত, সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত ও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল আমানত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'অঙ্গিকার, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি' আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে, মানুষ ও মানুষের মধ্যে এবং জাতি ও জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল চুক্তিকে বুঝায়।

মুমিন ব্যক্তি কখনও আমানতের খেয়ানত করে না এবং নিজের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করে না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ভাষণে বললেন ঃ

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهٗ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهٗ.

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই, আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দীনদারী নেই।" (বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি অভ্যাস পাওয়া যায় সে নিখাদ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন একটি পাওয়া যায় সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি অভ্যাস হিসাবেই থাকে। সে চারটি অভ্যাস হচ্ছে– (১) তার কাছে আমানত সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত করে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়ায় লিপ্ত হলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে।" অন্য হাদীসে রয়েছে 'গালাগালি করে।' (বুখারী ও মুসলিম)

(৮) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ.

'এবং যারা নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে।'

পূর্বে ২ নং আয়াতে 'খুশূ'-এর আলোচনায় সালাত একবচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে 'সালাওয়াতিহিম' (নামাযসমূহ) বলা হয়েছে। উভয়ের

পার্থক্য এই যে, সেখানে মূল নামাযকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আর এখানে পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের সালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে।

'নামাযসমূহের সংরক্ষণ' অর্থ হচ্ছে- সে নামাযের ওয়াক্ত, নামাযের নিয়ম-কানুন, মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জিনিসের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখে। শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাক রাখে। উযু ঠিকমতো করে। কখনো যেন বিনা উযুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে। সঠিক ওয়াক্তে নামায পড়ার চিন্তা করে। ওয়াক্ত পার করে দিয়ে নামায পড়ে না। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি সহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে পড়ে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দা তার প্রভু আল্লাহর কাছে কিছু নিবেদন করছে। এমনভাবে পড়ে না যাতে মনে হয় একটি গৎবাঁধা বাক্য আওড়ে শুধুমাত্র বাতাসে কিছু বক্তব্য ফুঁকে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ. (৯)

"তারাই হবে অধিকারী, যারা নিজেদের অধিকার হিসাবে ফিরদাওস লাভ করবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

ফিরদাওস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানবজাতির প্রায় সমস্ত ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। সংস্কৃতে বলা হয় পরদেষা, প্রাচীন কালদীয় ভাষায় পরদেসা, প্রাচীন ইরানী (যিন্দা) ভাষায় পিরীদাইজা, হিব্রু ভাষায় পারদেস, আর্মেনীয় ভাষায় পারদেজ, সুরিয়ানী ভাষায় ফারদেসো, গ্রীক ভাষায় পারাইডাইসোস, ল্যাটিন ভাষায় প্যারাডাইস এবং আরবী ভাষায় ফিরদাওস।

শব্দটি এসব ভাষায় এমন একটি বাগানের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যার চারদিকে পাঁচিল দেয়া থাকে, বাগানটি বিস্তৃত হয়, মানুষের আবাসগৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেখানে সব ধরনের ফল, বিশেষ করে আংগুর পাওয়া যায়। বরং কোন কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে একথাও বুঝা যায় যে, এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু-পাখিও পাওয়া যায়।

কুরআনের পূর্বে আরবদের জাহেলী যুগের ভাষায়ও ফিরদাওস শব্দের ব্যবহার ছিল। কুরআনে বিভিন্ন বাগানের সমষ্টিকে ফিরদাওস বলা হয়েছে। যেমন সূরা কাহ্ফ-এ বলা হয়েছে ঃ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا "তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাওসের বাগানসমূহ।" (১৮ ঃ ১০৭)

এ থেকে মনের মধ্যে যে ধারণা জন্মে তা হচ্ছে এই যে, ফিরদৌস একটি বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ-বাগিচা-উদ্যান রয়েছে।

ফিরদাওসের উত্তরাধিকারী কারা হবে এ সম্পর্কে সূরা যুমারের ৭৩ ও ৭৪ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ.

"আর যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে বেহেশ্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে দলে দলে। এমনকি যখন তারা বেহেশ্তের কাছে পৌছবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে তখন তাদেরকে বেহেশ্তের রক্ষীরা বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক এবং অনন্তকাল অবস্থানের জন্য বেহেশ্তে প্রবেশ কর। তারা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের ব্যাপারে তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন এবং আমাদেরকে বেহেশ্তের এ যমীনের মালিক করেছেন। আমরা বেহেশ্তের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করব। কত উত্তম পুরস্কার রয়েছে নেক আমলকারীদের জন্য!"

সূরা আল-মু'মিনূনের প্রথম এ আয়াতগুলোতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক. যারাই কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মেনে নিয়ে এ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করবে এবং এ নীতির অনুসারী

হবে তারা যে কোন দেশ, জাতি ও গোত্রেরই হোক না কেন অবশ্যই তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

দুই. সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষণা অথবা নিছক সৎচরিত্র ও সৎকাজের ফল নয়, বরং উভয়ের সম্মিলনের ফল। মানুষ যখন আল্লাহর দেয়া পথনির্দেশ মেনে চলে এবং তদনুযায়ী নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিকতা ও সৎকর্মশীলতা সৃষ্টি করে তখন সে সফলতা লাভ করে।

তিন. নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সম্পদের প্রাচুর্য এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়, বরং তা একটি ব্যাপকতর কল্যাণকর অবস্থার নাম। দুনিয়ায় ও আখেরাতে স্থায়ী সাফল্য ও পরিতৃপ্তিকেই এ নামে অভিহিত করা হয়। এটি ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়া অর্জিত হয় না। পথভ্রষ্টদের সাময়িক সমৃদ্ধি ও সাফল্য এবং সৎ মুমিনদের সাময়িক বিপদ-আপদকে এ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য করা যেতে পারে না।

চার. মুমিনদের এ গুণাবলীকে নবী (সা)-এর মিশনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার এ বিষয়টিই সামনের দিকের ভাষণের সাথে এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক কায়েম করে। তৃতীয় রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাষণটি যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা এই যে, শুরুতে আছে অভিজ্ঞতা প্রসূত যুক্তি। অর্থাৎ এ নবীর শিক্ষা তোমাদেরই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ বিশেষ ধরনের জীবন, চরিত্র, কর্মকাণ্ড, নৈতিকতা ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা ভেবে দেখো, এ শিক্ষা সত্য না হলে এ ধরনের কল্যাণময় ফল কিভাবে সৃষ্টি করতে পারতো? এরপর হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ যুক্তি। অর্থাৎ মানুষের নিজের সত্তায় ও চারপাশের বিশ্বে যে নিদর্শনাবলী পরিদৃষ্ট হচ্ছে তা সবই তাওহীদ ও আখেরাতের এবং মুহাম্মদ (সা) প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারপর আসে ঐতিহাসিক যুক্তির কথা। এ যুক্তিগুলোতে বলা হয়েছে, নবী ও তাঁর দাওয়াত অস্বীকারকারীদের সংঘাত আজ নতুন নয়, বরং একই কারণে প্রাচীনকাল থেকে তা চলে আসছে। এ সংঘাতের প্রতিটি যুগে একই ফলাফলের প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় দলের মধ্যে কে সত্য পথে ছিল এবং কে ছিল মিথ্যার পথে।

শিক্ষা : ১। মুমিন লোকেরা সত্যের দাওয়াতকে গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরং এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর সত্যের দাওয়াতকে অবহেলা করে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিণাম এ দুনিয়ায় এবং আখেরাতের অনন্ত জীবনে ভোগ করতে হবে।

২। খুশূ-খুজুর সাথে নামায আদায় করা। নামায মানুষকে অনর্থ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে রাখে। আখেরাতে সকল হিসাবের আগে নামাযের হিসাব নেয়া হবে।

৩। যাকাত, পরিষ্কার হিসাব-নিকাশ করে এমনভাবে যাকাতের খাতে দিতে হবে যাতে আত্মার পরিশুদ্ধি, চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি ও অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি পরিশুদ্ধি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়।

৪। নিজেদের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ভালভাবে ঢেকে রেখে সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন : আলোচ্য সূরার শিক্ষাগুলো মুমিন জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারলেই জীবনের সফলতার পথ সহজ হয়ে যাবে। আসুন আমরা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ভাইয়েরা শপথ নেই যাতে আমাদের জীবনে এ শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করে সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে সমাজে দাঁড়াতে পারি এবং সমাজের সকলের নিকট এ শিক্ষাগুলো তুলে ধরতে পারি। এ তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ৫

বাহুল্য ধারণা-অনুমান, অন্যের দোষ অন্বেষণ ও গীবত করা মহাপাপ

৪৯. সূরা আল-হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-১৮, রুকূ-২

আলোচ্য আয়াত নং- ১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ .

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। "হে ঈমানদারগণ! বাহুল্য ধারণা-অনুমান থেকে বিরত থাকো। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তওবা কবুলকারী এবং অতীব দয়াবান।

শব্দার্থ : اَجْتَنِبُوْا - তোমরা বিরত থাকো, كَثِيْرًا - অত্যধিক, বাহুল্য, اَلظَّنِّ - ধারণা-অনুমান, بَعْضَ - কিছু, কতক, اِثْمٌ - পাপ, لاَ - না,

تَجَسَّسُوْا - তোমরা পরস্পরের গোপনীয় বিষয় খোঁজ করো, يَغْتَبْ - যেন গীবত করে, بَعْضُكُمْ - তোমাদের কেউ, بَعْضًا - কারো, اَيُحِبُّ - পছন্দ করে কি, اَحَدُكُمْ - তোমাদের কেউ, يَّأْكُلَ - খেতে, لَحْمَ - গোশত, اَخِيْهِ - তার ভাইয়ের, مَيْتًا - মৃত, فَكَرِهْتُمُوْهُ - তা তোমরা ঘৃণা করো, اتَّقُوْا - তোমরা ভয় করো, اِنَّ - নিশ্চয়, تَوَّابٌ - তওবা কবুলকারী, رَحِيْمٌ - অতীব মেহেরবান।

নামকরণ : এই সূরার চতুর্থ আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ। -এর "আল-হুজুরাত" শব্দটিকেই গোটা সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। হুজুরাত অর্থ ঘরের চার দেয়াল, কক্ষসমূহ।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় নাযিল হওয়া আইন-বিধান ও আসমানী হেদায়াতের সমন্বয় ও সমষ্টি। মূল বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইন- বিধান ও আসমানী হেদায়াতকে একটি সূরায় একত্র করে দেয়া হয়েছে। সূরায় আলোচিত বিষয়াদি দ্বারাই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা হতেও একথা জানা যায়। হাদীসের বর্ণনা হতে একথাও জানা যায় যে, উক্ত আইন-বিধানের অধিকাংশই মদীনা শরীফে নবী করীম (সা)-এর জীবনের শেষভাগে নাযিল হয়েছিল। যেমন ৪ নং আয়াতে বনী তামীম গোত্রের প্রতিনিধিগণ এসে নবী (সা)-এর বেগমগণের হুজুরাসমূহের বাইরে থেকে নবী করীম (সা)-কে ডাকাডাকি করছিল। নবী চরিত সংক্রান্ত সকল গ্রন্থে এ প্রতিনিধি দল আগমনের কাল ৯ম হিজরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ৬ষ্ঠ আয়াত সম্পর্কে বহু কয়টি হাদীস হতে জানা যায়, ওলীদ ইবনে ওকবাকে নবী করীম (সা) বনুল মুস্তালিক গোত্র হতে যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। আর ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হয়েছিলেন একথা অনেকেরই জানা।

আলোচ্য অংশের বিষয়বস্তু : এখানে মুসলমানদেরকে সেসব খারাপ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি

করে এবং যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। একে অপরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, বদনাম ও উপহাস করা, খারাপ নামে আখ্যায়িত করা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যের গোপনীয় বিষয় খোঁজা-খুঁজি ও অনুসন্ধান করা, অসাক্ষাতে মানুষের বদনাম করা, এগুলো এমনিতেই গুনাহের কাজ এবং সমাজে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে নামোল্লেখ করে হারাম ঘোষণা করেছেন।

ব্যাখ্যা : (ক) يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

"হে ঈমানদারগণ! বাহুল্য ধারণা-অনুমান থেকে বিরত থাকো। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে।"

ধারণা বা অনুমান করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং খুব বেশী অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করা এবং সব রকম অনুমানের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ কোন কোন অনুমান পাপ। এ নির্দেশটি বুঝার জন্য আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত, ধারণা কত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের নৈতিক অবস্থা কি?

এক প্রকারের ধারণা নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং দীনের দৃষ্টিতে কাম্য ও প্রশংসিত। যেমন আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা) ও ঈমানদারদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা। তাছাড়া তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণের যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই।

আরেক প্রকারের ধারণা, যাকে বাদ দিয়ে চলার কোন উপায় নেই। যেমন– আদালতে বিচারকের সামনে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয় তা যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত প্রায় ধারণার ভিত্তিতে ফয়সালা করা ব্যতীত আদালত চলতে পারে না। বিচারকের পক্ষে ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। আর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিশ্চিতরূপে যথার্থ নাও হতে পারে। প্রায় নিশ্চিত ধারণার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া উপায় থাকে না।

তৃতীয় এক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত খারাপ ধারণা হলেও বৈধ প্রকৃতির। এ ধারণা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যেমন– কোন ব্যক্তি

বা গোষ্ঠীর চরিত্র ও কাজকর্মে কিংবা তার দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও চালচলনে এমন সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠে যার ভিত্তিতে সে আর ভাল ধারণার যোগ্য থাকে না। বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের একাধিক যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান। এরূপ পরিস্থিতিতে শরীয়াত কখনো দাবি করে না যে, সরলতা দেখিয়ে মানুষ তার প্রতি অবশ্যই ভাল ধারণা পোষণ করবে। তবে এ বৈধ খারাপ ধারণা পোষণের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে, তার সম্ভাব্য দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিছক ধারণার ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে তার বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালানো ঠিক হবে না।

চতুর্থ প্রকারের ধারণা মূলত গুনাহ্। সেটি হচ্ছে বিনা কারণে কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা। আবার কোন কোন সময় কারো প্রতি মনস্থির করার বেলায় সবসময় খারাপ ধারণার উপর ভিত্তি করেই শুরু করা। আবার কখনো এমন লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও শিষ্টাচারের প্রমাণ দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির কথা ও কাজে ভাল ও মন্দের সমান সম্ভাবনা থাকে। আমরা যদি তাকে খারাপ হিসাবেই ধরে নেই, তাহলে তা গুনাহ্ বলে গণ্য হবে। যেমন কোন ভদ্রলোক মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় জুতা পরিবর্তন করে নেন। কেউ যদি বলে, জুতা চুরি করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছেন, অথচ কাজটি ভুল করেও তো হতে পারে। তাই ভালোর সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে খারাপ সম্ভাবনার দিকটি গ্রহণ করা খারাপ ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিশ্লেষণ থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, ধারণা করা কোন নিষিদ্ধ কাজ নয়। কোন কোন পরিস্থিতিতে তা পছন্দনীয়, কোন কোন পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কোন কোন পরিস্থিতিতে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জায়েয, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই নাজায়েয। তাই একথা বলা হয়নি যে, ধারণা করা থেকে বিরত থাক। বলা হয়েছে, অধিক মাত্রায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। নির্দেশটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে, কোন কোন ধারণা গুনাহ্।

(খ) وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط

“তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না।”

একে অপরের গুপ্ত রহস্য খোঁজা-খুঁজি করো না, অন্যের দোষ প্রচার করে বেড়িও না। কারো ব্যক্তিগত চিঠি দেখো না, কারো গোপনীয় কথা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করো না। প্রতিবেশীর ঘরের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং নানা উপায়ে কারো পারিবারিক জীবন অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চেষ্টা করা, এসব নিষিদ্ধ অনুসন্ধানের মধ্যে গণ্য। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর খুতবায় দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেন ঃ

"হে ঐসব লোকেরা, যারা মুখে ঈমানের কথা বলো কিন্তু ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি তালাশে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ্ যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" (আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কেউ যদি কারো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে তাহলে সে যেন একজন জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যা সন্তানকে জীবন দান করলো।" (আল-জাস্‌সাস)

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং সরকারের জন্যও। সরকারের মূল দায়িত্ব সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা। সরকারের এটা দায়িত্ব নয় যে, সে একটি গোয়েন্দা বিভাগ কায়েম করে মানুষের গোপনীয় দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে। বরং যেসব অসৎ প্রবণতা ও দোষ-ত্রুটি এবং খারাপ চালচলন প্রকাশিত হয়ে পড়বে, কেবল তার বিরুদ্ধেই তার শক্তি প্রয়োগ করবে।

জনগণকে শিক্ষা দান, নসীহত প্রদান, তাদের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা সরকারকে করতে হবে।

হযরত উমার (রা)-এর একটি ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একদা রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইছিল। তাঁর মনে সন্দেহ হলে তিনি প্রাচীরের উপর দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেন সেখানে শরাব প্রস্তুত করা হয়েছে। তার সাথে এক নারীও রয়েছে। হযরত উমর (রা) চিৎকার

দিয়ে বললেন, "ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই কি মনে করেছিস যে, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি আর তিনি তোর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেন না? জবাবে সে বললো, আমীরুল মু'মিনীন! তাড়াহুড়া করবেন না। আমি যদি একটি গুনাহ্ করে থাকি তবে আপনি তিনটি গুনাহ্ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা দোষ-ক্রুটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আপনি দোষ-ক্রুটি খুঁজেছেন। আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো, কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ঘর ছাড়া অনুমতি না নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না, কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি আমার ঘরে প্রবেশ করেছেন।

এ জবাব শুনে হযরত উমর (রা) ভুল স্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে কল্যাণ ও সুকৃতির পথ অনুসরণ করবে। (মাকারিমুল আখলাক)

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের দোষ-ক্রুটি বের করা এবং তাদের শাস্তি দেয়া শুধু কোন ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।" (আবু দাউদ)

তবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিলে অথবা তাদের কোন অপরাধ সংগঠিত করার আশংকা দেখা দিলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

তাছাড়া কারো সাথে লেনদেন করার ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব আসলে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য সে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান ও খোঁজ-খবর নিতে পারবে।

গীবত– নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, গীবত কাকে বলে? তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি যদি নিজের ভাইয়ের কথা অগোচরে এমনভাবে প্রকাশ কর যা তাঁর কাছে খারাপ লাগবে, তবে এর নাম গীবত। তাঁর কাছে

নিবেদন করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে সে সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দিলেন ঃ যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে তা বর্তমান থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে, আর তার মধ্যে যদি সে দোষ না থাকে তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে।

কোন ব্যক্তির অগোচরে বা মৃত্যুর পর তার দোষ বর্ণনা করার যদি এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়– শরীয়াতের দৃষ্টিতে যা সংগত প্রয়োজন বলে গণ্য এবং গীবত ব্যতীত যদি সে প্রয়োজন পূরণ করার কোন পথ না থাকে, যদি গীবত না করা হয় তবে গীবত অপেক্ষা অধিক খারাবী সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত– এরূপ ক্ষেত্রে গীবত নিষিদ্ধ নয়।

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ব্যক্তি তার অভিযোগ এমন ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করতে পারে যার নিকট অত্যাচার নিবারণের আশা করা যায়।

কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দুষ্টামী থেকে লোকদেরকে সতর্ক করা যাতে লোকেরা তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। সেসব লোকদের বিরুদ্ধে আওয়ায তোলা ও তাদের দোষ সমালোচনা করা যারা দুষ্কৃতি, দুর্নীতি, অনাচার বিস্তার করছে, বেদআত ও গোমরাহীর প্রচার প্রসার করছে। (বিস্তারিত জানতে হলে তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল-হুজুরাতের ২৬ নং টীকা দেখুন)।

(গ) اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তওবা কবুলকারী এবং অতীব দয়াবান।"

এখানে আল্লাহ তায়ালা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজ চরম ঘৃণিত হওয়ার কথা বুঝাতে চেয়েছেন। মৃতের গোশত খাওয়া এমনিতেই ঘৃণ্য কাজ। সে গোশত যদি মৃত মানুষের হয়, আর সেই মৃত মানুষটি যদি আপন ভাই হয় তাহলে তো আরও জঘন্য। সে

যদি তা খেতে রাজি না হয়, ঘৃণাবোধ করে, তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, সে তার কোন মুমিন ভাইয়ের অগোচরে তার মান-মর্যাদার উপর হামলা করবে, যেখানে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বেইজ্জতি বা অপমান করা হচ্ছে। মৃত্যুর পর তার লাশকে ছিঁড়ে খাচ্ছে তা তার জানার সুযোগ নেই। তদ্রূপ যার গীবত করা হচ্ছে সে সারা জীবনেও জানতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি কার সামনে তার মান-সম্মানের উপর আঘাত হেনেছিল? এ গীবত দ্বারা সে কোন কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে সমাজের কিছু লোকের নিকট তার মান-মর্যাদা নষ্ট হবে। তাই গীবত করার কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া স্বদৃশ।

অতঃপর যদি কারো গত জীবনে এ ধরনের গুনাহর কাজ হয়ে থাকে, তবে তারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর দরবারে তওবা করে নিজের গুনাহ মাফ করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু।

শিক্ষা : ১। আমাদেরকে বাহুল্য ধারণা-অনুমান থেকে বিরত থাকতে হবে।

২। অন্যের দোষ অন্বেষণ করা দূষণীয়। এতে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস জন্ম নেয়।

৩। গীবত করা নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। তাই তা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

৪। সকল প্রকার গুনাহ থেকে পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার নিকট বার বার তওবা করা উচিত।

বাস্তবায়ন : বর্তমান সমাজে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ না করে নিজের সুবিধামত চলছে। হালাল-হারাম, বিধি-নিষেধ অমান্য করে আনন্দ-ফূর্তি, আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধা নিয়েই মানুষ ব্যস্ত আছে। মানুষকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? ইবাদত কাকে বলে ইত্যাদি ধারণা দিয়ে সমাজ সংস্কার করতে হবে। মানুষের মধ্যে আল্লাহ ভীতির সঞ্চার করতে হবে। সূরা হুজুরাতে ১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যার আলোকে উপস্থাপিত উপরোক্ত চারটি শিক্ষা যেন আমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করছি।

দারস : ৬

আল্লাহর স্মরণে গাফিল ব্যক্তির দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ, পরকালে আল্লাহ তাকে ভুলে যাবেন এবং সে উঠবে অন্ধ হয়ে

২০. সূরা ত্বা-হা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১৩৫, রুকূ-৮

আলোচ্য আয়াত নং- ১২৪, ১২৫, ১২৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٢٤) وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى. (١٢٥) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا. (١٢٦) قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ج وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে)। (১২৪) "যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, দুনিয়ায় হবে তার জন্য সংকীর্ণ জীবন এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো। (১২৫) সে বলবে, হে আমার প্রভু! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম কিন্তু এখন কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে? (১২৬) তিনি বলবেন, "হাঁ, আমার আয়াতগুলো যখন তোমার নিকট এসেছিল, তুমি তা এমনি ভুলে গিয়েছিলে, আজ ঠিক সেভাবেই তোমাকেও ভুলে যাওয়া হয়েছে।"

শব্দার্থ : اَعْرَضَ - বিমুখ হবে, ذِكْرِىْ - আমার উপদেশ, فَاِنَّ - নিশ্চয়

তখন, لَهٗ - তার হবে, مَعِيْشَةً - জীবন যাপন, ضَنْكًا - সংকুচিত, نَحْشُرُهٗ - আমরা তাকে উঠাবো, الْقِيٰمَةِ।- কিয়ামত, اَعْمٰى - অন্ধ অবস্থায়, لِمَ - কেন, حَشَرْتَنِىْ - আমাকে আপনি উঠালেন, قَدْ - নিশ্চয়, كُنْتُ - আমি ছিলাম, بَصِيْرًا। - চক্ষুষ্মান, كَذٰلِكَ - এমনিভাবেই, اَتَتْكَ - তোমার কাছে এসেছিল, اٰيٰتُنَا - আমাদের নিদর্শনাবলী, فَنَسِيْتَهَا - তা তুমি ভুলে গিয়েছিলে, كَذٰلِكَ - এভাবেই, تُنْسٰى - তুমি বিস্মৃত হয়েছ।

নামকরণ : সূরার প্রারম্ভেই طٰهٰ দু'টি হরফে মুকাত্তাআত্ (বিচ্ছিন্ন অক্ষর) রয়েছে। এরূপ বিচ্ছিন্ন অক্ষর পবিত্র কুরআনের অনেক সূরার প্রারম্ভেই দেখা যায়। এগুলোর অর্থ আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন। এই দু'টি অক্ষর طٰهٰ (ত্বাহা)-কেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : সূরা মার্‌য়াম নাযিল হওয়ার কাছাকাছি সময়ে এবং মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় বা পরে সূরাটি নাযিল হয়। হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই এটি নাযিল হয়, তা নিশ্চিত।

হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বিবরণ হলো, তিনি যখন নবী করীম (সা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে খোলা তরবারি নিয়ে বের হয়েছিলেন, তখন পথের মাঝে এক ব্যক্তি বললো, আগে নিজের ঘর সামলাও। তোমার বোন ও ভগ্নিপতি নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে। একথা শুনে তিনি বোনের বাড়িতে পৌঁছলেন। বোন ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ তখন হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)-র নিকট এক লিখিত কালাম শিক্ষা লাভ করছিলেন। হযরত ওমরের উপস্থিতি টের পেয়ে বোন সহীফাখানি লুকিয়ে ফেললেন। ইতিপূর্বে হযরত ওমর পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। পরে তাঁর ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদের উপর হামলা ও মারধর চালালেন। বোন স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হলেন এবং তাঁর মাথা ফেটে গেল। শেষ পর্যন্ত বোন ও ভগ্নিপতি বললেন, "হাঁ, আমরা মুসলমান

হয়েছি– তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। বোনের মাথা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে হযরত ওমর অনেকটা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও। বোন ভাইকে প্রতিজ্ঞা করলেন, এটা যেন ছিড়ে ফেলা না হয়। পরে বললেন, তুমি গোসল করে না আসা পর্যন্ত এ পাক সহীফা স্পর্শ করতে পারবে না। হযরত ওমর গোসল করলেন এবং সহীফা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। এ সহীফাতে আলোচ্য সূরা ত্বা-হা লিখিত ছিল। পড়তে পড়তে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো : কী সুন্দর কালাম! একথা শুনামাত্র হযরত খাব্বাব (রা) আড়াল থেকে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম! গতকাল আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, "হে আল্লাহ! আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবু জাহল) অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাব এ দু'জনের কোন একজনকে ইসলামের সমর্থক বানিয়ে দাও।" ঠিক তখনই হযরত খাব্বাব (রা)-এর সঙ্গী হয়ে তিনি নবী করীম (সা) নিকট উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের অল্পকাল পরেই এ ঘটনা ঘটে।

আলোচ্য বিষয় : সূরাটির সূচনা হয় এভাবে, হে মুহাম্মদ! অযথা তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য এ কুরআন নাযিল করা হয়নি। পার্বত্য শিলাখণ্ডের বুক চিরে দুধের নহর প্রবাহিত করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বে এবং হঠকারীদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালাতেই হবে– এ দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হয়নি। আসলে এটি তো একটি উপদেশ ও স্মারক, যার মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগবে। যারা আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচতে চায়, তারা যেন সরল-সোজা পথ অবলম্বন করে। এটি যমীন ও আসমানের মালিক আল্লাহর কালাম। তিনি ব্যতীত আর কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। এ দুইটি মহাসত্য চিরন্তন, অটল ও অকাট্য। কেউ মানুক আর না মানুক তাতে কিছু আসে যায় না।

এ ভূমিকার পর সহসা হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনী শুরু করা হয়। এ কাহিনীতে সে সময়কার অবস্থার কোন উল্লেখ না থাকলেও যে উপলক্ষে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তখনকার অবস্থার সাথে কতকটা মিল থাকার দরুন

মক্কাবাসীদেরকে আরও কিছু কথা বলা হচ্ছে বলে মনে হয়। প্রথমে এ কথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, সে সময় আরববাসীদের উপর বহু সংখ্যক ইহুদীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় এবং রোম ও আবিসিনিয়ার রাজ্যের প্রভাবে আরবগণ সাধারণত হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহর নবী বলে মান্য করত। এ মহাসত্য সম্মুখে রাখার পর এখন দেখুন এ ঘটনায় মক্কাবাসীদের প্রতি পরোক্ষভাবে কি কি বলা হয়েছে, এখানে তা উল্লেখ করছি।

(ক) আল্লাহ্ তায়ালা কাউকে নবুয়াত দান করার সময় ঢাকঢোল বাজিয়ে, বিরাট জনসমুদ্র ডেকে উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবুয়াত দান করেন না। এজন্য আসমান থেকেও ঘোষণা দেয়া হয় না, আর যমীনের উপর ফেরেশতারা দলে দলে এসে এর ঘোষণা করেন না। হয়তো তোমাদের জানা আছে যে, হযরত মূসা (আ)-কে খুব গোপনে এবং সাদাসিধাভাবেই নবুয়াত দেয়া হয়েছিল। তাই আজ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে এর বিপরীত হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

(খ) হযরত মূসা (আ)-কে নবী নিযুক্ত করার সময় আল্লাহ্ তায়ালা (তাওহীদ ও আখেরাত) সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঠিক একই কথা আজ হযরত মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মাঝে পেশ করছেন।

(গ) আজ যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে শক্তি-সামর্থ্য ও সৈন্য-সামন্ত ব্যতীত সম্পূর্ণ একাকী কুরাইশদের সামনে সত্য দীনের পতাকাবাহী বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবেই হযরত মূসা (আ)-কে একাকী ফেরাউনের মত অত্যাচারী বাদশাহকে নাফরমানী ও আল্লাহদ্রোহিতা হতে বিরত থাকার উপদেশ দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু সেজন্য তাঁকে কোন সৈন্য-সামন্ত ও শক্তি দান করা হয়নি। আসলে আল্লাহর কাজ এমনি আশ্চর্য ধরনের হয়ে থাকে। তিনি মাদায়েন হতে মিসরগামী মুসাফির হযরত মূসা (আ)-কে পথ চলা অবস্থায় পাকড়াও করে বলেন, যাও যুগের বিভৎস অত্যাচারী বাদশাহর সামনে দীনের দাওয়াত পেশ কর। তিনি তাঁর আবেদনক্রমে তাঁর ভাই হযরত হারূন (আ)-কে তাঁহার সাহায্যকারী নিযুক্ত

করে দিলেন। এছাড়া কোন সৈন্য বাহিনী বা হাতি-ঘোড়া এ বিরাট কাজের জন্য তাঁর সংগে দেয়া হয়নি।

(ঘ) আজ মক্কাবাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যেসব প্রশ্ন, আপত্তি, সন্দেহ বা অভিযোগ উত্থাপন করছে, যেসব জুলুম ও উৎপীড়নের হাতিয়ার তারা ব্যবহার করছে, তদপেক্ষাও বেশী পরিমাণে ব্যাপকভাবে ফেরাউন হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সেসব ব্যবস্থাপনা কিরূপে ব্যর্থ হয়ে গেল তা লক্ষণীয়। সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ফেরাউন জয়ী হতে পারলো না। অথচ সহায়-সম্বলহীন আল্লাহর নবী মূসা (আ) জয়ী হলেন। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে শান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে যে, নিজেদের অসহায় অবস্থা ও মক্কার কুরাইশ কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাজ-সরঞ্জাম দেখে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে যাবে না। যে কাজের পিছনে আল্লাহর সম্মতি রয়েছে শেষ পর্যন্ত তাই সফলতা লাভ করে।

(ঙ) বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে একটা সাক্ষ্য পেশ করে দেখানো হয়েছে যে, দেবতা বা মাবুদ রচনার কাজ কতনা হাস্যকর ? আল্লাহর নবী এ ঘৃণ্য কাজের বিপক্ষে ছিলেন। অতএব আজ হযরত মুহাম্মদ (সা) শিরক ও মূর্তি পূজার বিরোধিতা করছেন, নবুয়াতের ইতিহাসে তা কোন নতুন ঘটনা নয়।

মূসা (আ)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের দ্বন্দ্ব ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে কুরাইশদের দ্বন্দ্বের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ই এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারপর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলা হয়েছে, আসলে এই কুরআন একটি মহামূল্যবান উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। তোমাদের নিজেদের ভাষায় তোমাদেরকে বুঝাবার জন্য নাযিল হয়েছে। এ কুরআনের উপর আমল করলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে, আর আমল করা না হলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে।

অতঃপর হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, কখনও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যাওয়া মানসিক দুর্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর ধোঁকা থেকে খুব কম মানুষই রক্ষা পেতে পারে। তবে ভুল ধরা পড়লে,

স্বীকার করা এবং তওবা করা উচিত। ভুল করে তার উপর জিদ করে ভুল স্বীকার না করা, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার শামিল। এর পরিণাম নিজেকেই ভুগতে হয়।

অবশেষে নবী মুহাম্মদ (সা) ও মুসলমানদেরকে নসীহত করা যাচ্ছে যে, সত্য অমান্যকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা বা ধৈর্যহারা হওয়া ঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে, তিনি কোন অপরাধীকে সহসা পাকড়াও করেন না। তিনি প্রত্যেককেই সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা তাদের অন্যায় বাড়াবাড়ি ও যুলুম-পীড়ন সহ্য করে তাদের নসীহত করার দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় পালন কর।

এ পর্যায়ে নামায আদায়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নামাযের বদৌলতে ঈমানদার লোকেরা ধৈর্য, সহনশীলতা, অল্পেতুষ্টি, আল্লাহর ফায়সালায় রাজী ও খুশি থাকা এবং আত্মসমালোচনা প্রভৃতি গুণসমূহ লাভ করতে পারে। সত্য দীনের দাওয়াত দানের ব্যাপারে এই গুণাবলী একান্ত প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা : (ক) وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا.

"যে ব্যক্তি আমার যিকির হতে বিমুখ হবে, দুনিয়ায় হবে তার সংকীর্ণ জীবন। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম কিন্তু এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে?"

এখানে "যিকর" (ذِكْرٌ) দ্বারা উদ্দেশ্য 'কুরআন মজীদ'। অনেক ওলামায়ে কেরাম এই মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ যারা কুরআন থেকে বিমুখ হবে, তাদের ব্যাপারে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে যে, তাদের হালাল জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যাবে, হারাম পথের উপার্জন প্রশস্ত হবে, যদ্দরুন লোভ-লালসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, সম্পদ যতই হবে ততই আরো পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে

উঠবে, কিন্তু তবু নিজেকে অভাবী মনে করবে, সুখ-শান্তি বলতে কিছু থাকবে না। দেখলে মনে হবে সুখী কিন্তু অশান্তিতেই জীবন কাটবে, আর আখেরাতের জীবন হবে অন্ধত্বের জীবন, যা এ আয়াতেই ঘোষণা করা হয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ পড়েছে, একে নিজের নাজাতের উসীলা বানিয়ে নিয়েছে, তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মেনে চলেছে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজনের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের জন্য দোযখ অবধারিত হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের ভেতর কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে, তার জন্য প্রতিটি হরফে এক শত নেকী লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি নামাযের বাইরে উযু সহকারে তা পড়ে, তার জন্য প্রতিটি হরফে ২৫টি নেকী লেখা হয় এবং উযু ছাড়া পড়লে ১০টি নেকী লেখা হয়। (দুররাতুন-নাসিহীন)

এতে বুঝা যায়, এখানে যিকির দ্বারা কুরআনই উদ্দেশ্য, যেহেতু পবিত্র কুরআনের অনুসরণ ও তেলাওয়াতের কারণে বান্দাহর জন্য জান্নাত ও নেকী বরাদ্দ হয় এবং পরকালের অনাবিল স্থায়ী সুখ-শান্তি হাসিল হয়, তাহলে কুরআন থেকে বিমুখ হলে অবশ্যই দুনিয়ায় জীবিকা সংকীর্ণ ও আখেরাতের জীবনে তথা হাশরে ও দোযখে অশান্তি নিশ্চিত থাকবে।

আবার অনেক ওলামায়ে কেরাম বলেন, যারা কুরআন শরীফ পড়ে আবার ভুলে যায়, এ আয়াতের উদ্দেশ্য তারা। অনেকে বলেন, এ আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে যারা তাওহীদকে অস্বীকার করেছে, অর্থাৎ এখানে যিকির দ্বারা তাওহীদ, আল্লাহ্র একত্ব উদ্দেশ্য। অনেকে বলেন, এখানে "তাওহীদ" ও "তাআত" (আনুগত্য) উদ্দেশ্য অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র একত্ব ও আনুগত্য থেকে বিমুখ হবে, তারাই এ শাস্তির যোগ্য হবে। অনেকে বলেন, এখানে যিকির অর্থ ইলম। যেমন "ফাছআলূ আহলায্ যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামূন" আয়াত থেকে বুঝা যায়, অর্থাৎ ইলমে দীন থেকে যারা বিমুখ হবে, তথা ইলমে দীন অন্বেষণ করবে না, ইলমে দীনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা

করবে না, ইলমে দীনের সাথে শত্রুতা রাখবে, তারা এ শাস্তি পাবার যোগ্য হবে, এ শাস্তির উপযোগী হবার জন্য ইলমে দীন থেকে বিমুখ থাকাটাই কারণ হবে।

অনেকে বলেন, যিকির অর্থ মৌখিক যিকির, অর্থাৎ যারা আল্লাহর যিকির করবে না, তারা এ শাস্তির উপযোগী হবে। আর অনেকে বলেন, যিকির অর্থ নামায, যেমন "ফাসআও ইলা যিক্‌রিল্লাহ্" আয়াত থেকে অনুমিত হয়। অর্থাৎ যারা নামায পড়বে না, তারা এ শাস্তির যোগ্য হবে। তাদের ব্যাপারে এ আয়াত প্রযোজ্য ? (তাফসীরে হানাফী)

এ আয়াতের তাফসীরে এও বর্ণিত আছে যে, বান্দাহ যখন অল্পে তুষ্ট হয় না, তখন এটাও জীবিকা সংকীর্ণতার শামিল।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, যিকির থেকে বিমুখ অর্থ আল্লাহ্ থেকে বিমুখ হওয়া। আর আল্লাহ্ থেকে বিমুখ সেই ব্যক্তিই হয়, যার উপর তার দুশমন শয়তান সওয়ার হয়, সে শয়তান সব ধরনের গোমরাহী ও ধ্বংসাত্মক কাজে তাকে লিপ্ত করিয়ে দেয়, ফলে তার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায়, ভ্রষ্টতা বেড়ে যায়, যদ্দরুন তার মত বদবখত আর কেউ থাকে না। (বাহরুল উলূম)

আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হলে পার্থিব জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের শিকার হতে হয়। হাজার রকমের অবৈধ চেষ্টা তদবিরের ফলে দুনিয়ার আর্থিক সাফল্য ঘটবে, সপ্ত রাজ্যের বাদশা হলেও তার শান্তি ও স্বস্তি মিলবে না। কোটিপতি হলেও চঞ্চলতা, অস্থিরতা, শারীরিক ও মানসিক অশান্তি তাকে ছাড়বে না। শুধু তাই নয়, পরকালে এমন ব্যক্তিকে অন্ধ করে উঠানো হবে। এই অন্ধত্ব হচ্ছে তার পার্থিব জীবনের গাফলতি ও উদাসীনতার শাস্তি। সে তখন আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করবে, কেন তাকে অন্ধ করে উঠানো হলো, সে তো দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিল? উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, দুনিয়াতে তার সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির শাস্তিস্বরূপ তাকে অন্ধ করে উঠানো হয়েছে। সে দৃষ্টিশক্তির ব্যবহারে সীমালংঘন করেছে। আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবলোকন করার পরিবর্তে অসৎ কাজে ব্যবহার করেছে। কাজেই তারই ইহ-জীবন কষ্টদায়ক এবং পরকালীন জীবনে তাকে অন্ধত্ব বরণ করতে হবে।

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ج وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى - (খ)

"আল্লাহ বলবেন, হাঁ, এভাবেই তো আমার আয়াতগুলো যখন তোমার নিকট এসেছিল, তুমি তাকে ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হয়েছে।"

কিয়ামতের শুরু থেকে জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত অপরাধীরা যে সকল বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হবে আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সেগুলো পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি অবস্থা হচ্ছে :

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ.

"তুমি এ জিনিস থেকে গাফলতির মধ্যে পড়েছিলে, এখন আমি তোমার সামনে থেকে পরদা সরিয়ে দিয়েছি, আজ তোমার দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ।" (সূরা ক্বাফ : ২২) অর্থাৎ আজ তুমি স্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছো।

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে :

وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتَابًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا. اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

"কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য একটি কার্যবিবরণী বের করবো, যাকে সে পাবে উন্মুক্ত কিতাব হিসাবে। পড়ো তোমার কার্যবিবরণী। আজ নিজের হিসাব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৩-১৪)

তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে :

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

"আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে, এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।" (সূরা ইয়াসীন : ৬৫ আয়াত)

আমাদের আলোচ্য আয়াতের মধ্যে কেয়ামতের অবস্থাগুলোর মধ্যে এখানে একটি অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় অপরাধীরা আখেরাতের ভয়াবহ দৃশ্য ও নিজেদের কুকর্মের পরিণতি খুব ভালভাবেই দেখবে। তাদের দৃষ্টিশক্তি এগুলো দেখার জন্যই দেয়া হবে।

আর অন্যান্য সবকিছু দেখার ব্যাপারে তারা হবে অন্ধের মত। নিজের চলার পথ দেখতে পাচ্ছে না, হোঁচট খাচ্ছে, কোন দিকে যাবে, কিভাবে প্রয়োজন পূরণ করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। আমাদের আলোচ্য অংশের শেষ আয়াতটিতে এ অবস্থাটিকে তুলে ধরা হয়েছে : "তুমি দুনিয়ার জীবনে যেরূপে আমার আয়াতগুলো ভুলে গিয়েছিলে, তেমনি আলমে আখেরাতে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" অর্থাৎ তুমি কিসের অভাব অনুভব করছো, কোথায় হোঁচট খাচ্ছো, আঘাত পাচ্ছো এবং বঞ্চিত হচ্ছো, আজ তার কোন পরোয়া করা হবে না। তোমার প্রতি কোনরকম ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। তুমি বঞ্চিত, উপেক্ষিত, অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির অতল তলে নিক্ষিপ্ত হবে।

শিক্ষা : ১। দুনিয়ায় যে ব্যক্তি আল্লাহর কুরআনে বর্ণিত হেদায়াত অনুসরণ করে চলবে, সে বিভ্রান্ত হবে না, দুর্ভাগ্যেও নিমজ্জিত হবে না।

২। যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত, উপদেশ ও নসীহত থেকে বিমুখ হবে, দুনিয়ায় হবে তার সংকীর্ণ জীবন। আর পরকালে তাকে অন্ধ করে উঠানো হবে। বিড়ম্বনা ব্যতীত তার ভাগ্যে কখনও শান্তি, নিরাপত্তা বা নির্মল আনন্দ নসীব হবে না।

বাস্তবায়ন : আল-কুরআন হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন বিধান বা হেদায়াত। এই হেদায়াত নিজে অনুসরণ করতে হবে এবং অন্যকেও অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দিতে হবে। আমাদের নিজেদেরকে আখেরাতের বিপর্যয় থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আল-কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দারস : ৭

কেউ কারো বোঝা বহন করবে না, প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী

৬. সূরা আল-আন'আম

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১৬৫, রুকূ-২০

আলোচ্য আয়াত নং- ১৬১-১৬৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٦١) قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج دِيْنًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. (١٦٢) قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. (١٦٣) لَاشَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. (١٦٤) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ط وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ج وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ج ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ. (١٦٥) وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (১৬১) "বলুন, আমার প্রতিপালক নিঃসন্দেহে আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথ দেখিয়েছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইব্‌রাহীমের অবলম্বিত আদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৬২) বল, আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। (১৬৩) তাঁর কোন শরীক নেই, আর একথা (বলার জন্যই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমি প্রথম। (১৬৪) বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর কোন রব অনুসন্ধান করবো? অথচ তিনিই সবকিছুর একমাত্র রব। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সকলকেই তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের যাবতীয় মতবিরোধের বিষয় তোমাদের অবহিত করবেন। (১৬৫) তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের যা দিয়েছেন সে সম্পর্কে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি অতি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

শব্দার্থ : اِنَّنِىْ - নিশ্চয় আমাকে, هَدٰنِىْ - আমাকে হেদায়াত করেছেন, صِرَاطٍ - পথের, مُّسْتَقِيْمٍ - সরল সঠিক, دِيْنًا দীন, قِيَمًا - সুপ্রতিষ্ঠিত, مِلَّةَ - পথ, পন্থা, حَنِيْفًا - একনিষ্ঠ, كَانَ - সে ছিল, مِنْ - অন্তর্ভুক্ত, الْمُشْرِكِيْنَ - মুশরিকদের, صَلَاتِىْ - আমার নামায, نُسُكِىْ - আমার কুরবানী, مَحْيَاىَ - আমার জীবন, مَمَاتِىْ - আমার মরণ, الْعٰلَمِيْنَ - বিশ্বজাহানের, بِذٰلِكَ - এভাবেই, اُمِرْتُ - আমি আদিষ্ট হয়েছি, اَوَّلُ - প্রথম, الْمُسْلِمِيْنَ - আত্মসমর্পণকারীদের, اَغَيْرَ اللّٰهِ - আল্লাহ ব্যতীত কি? اَبْغِىْ - খুঁজব আমি, رَبًّا - রব (অন্য কোন) كُلُّ - সব, شَىْءٍ - কিছুর, تَكْسِبُ - অর্জন করে, نَفْسٍ - ব্যক্তি, عَلَيْهَا - তাহার উপর, تَزِرُ - বোঝা উঠাবে, وَازِرَةٌ - কোন বোঝা বহনকারী,

وِزْرَ - বোঝা, اُخْرٰى - অন্যের, مَّرْجِعُكُمْ - তোমাদের প্রত্যাবর্তন, فَيُنَبِّئُكُمْ - তোমাদের তখন অবহিত করবেন, بِمَا - ঐ বিষয়ে, كُنْتُمْ - তোমরা ছিলে, فِيْهِ - যার মধ্যে, تَخْتَلِفُوْنَ - মতবিরোধ করতে, جَعَلَكُمْ - তোমাদের বানিয়েছেন, خَلٰٓئِفَ - প্রতিনিধি, وَرَفَعَ - উন্নীত করেছেন, بَعْضَكُمْ - তোমাদের কাউকে, فَوْقَ - উপর, دَرَجٰتٍ - মর্যাদাসমূহে, لِيَبْلُوَكُمْ- তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, اٰتٰكُمْ - তোমাদের দান করেছেন, سَرِيْعُ - তৎপর, الْعِقَابِ। শাস্তিদানে, لَغَفُوْرٌ - অবশ্যই ক্ষমাশীল, رَّحِيْمٌ - মেহেরবান।

নামকরণ : আন'আম অর্থ- গৃহপালিত পশু। এ সূরার ১৬ ও ১৭ রুকূতে গৃহপালিত পশুর হালাল-হারাম সম্পর্কে আরববাসীদের কাল্পনিক ও কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। তাই এ সূরার নাম দেয়া হয়েছে আল-আন'আম (গবাদি পশু)।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-র বর্ণনামতে সূরাটি একবারেই মক্কায় নাযিল হয়। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-র বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) উটনীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় এ সূরা নাযিল হতে থাকে। তখন আমি উটনীর লাগাম ধরাছিলাম। ওহী নাযিলের সময় ভারে মনে হচ্ছিল যেন উটনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।" হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সূরাটি রাতে নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) সে রাতেই সূরাটি লিপিবদ্ধ করান।

এ সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয়, এটা মক্কী যুগের শেষদিকে নাযিল হয়েছে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদের (রা) রেওয়ায়াতটিও একথার সত্যতা প্রমাণ করে। তিনি হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করার আগে ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে তিনি মক্কায় নবী (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে থাকেন তবে তা তাঁর মক্কায় অবস্থানের শেষ বর্ষে হয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন মদীনার আনসার দলীয়। শেষ বর্ষের পূর্বে মদীনাবাসীদের সাথে নবী (সা)-এর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ হয়নি, যার ফলে তাদের এক মহিলা তাঁর খেদমতে হাজির হতে পারেন।

শানে নুযূল : নাযিলের সময় নির্ধারণের পর এ সূরা নাযিলের কারণ সহজেই ধারণা করা যায়। দাওয়াত প্রচারের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বারটি বছর চলে যায়। কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন চরম আকার ধারণ করে। তাদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের এক বিরাট সংখ্যক লোক হিজরত করে হাবশায় গমন করেন। নবী করীম (সা)-এর ছায়াদানকারী চাচা আবু তালিব ও প্রাণের বিবি খাদীজা (রা) তখন আর দুনিয়াতে নেই। বৈষয়িক সকল আশ্রয়-নির্ভর হতে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠিন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে চললেন। তাঁর প্রচারে আশপাশের গোত্রসমূহের মধ্যে বহু সৎলোক ইসলাম কবুল করে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে গোটা আরবজাতি তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করছিল। কোথাও কোন ব্যক্তির ঈমান গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ পেলে তিরস্কার, দৈহিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কচ্ছেদ প্রভৃতি আঘাতে জর্জরিত ও পর্যুদস্ত হতে হত। এই অন্ধকারময় পরিবেশে একমাত্র মদীনার দিক থেকে এক অস্পষ্ট আলোকোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মদীনার আওস ও খাযরাজ বংশের প্রভাবশালী লোকেরা গোপনে মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আভ্যন্তরীণ কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

এই সামান্য সূচনায় ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা কোন সাধারণ মানুষ দেখতে পেতো না। সাধারণ দৃষ্টিতে লোকেরা দেখতে পেতো যে, ইসলাম একটি দুর্বলতম আন্দোলন। তার পশ্চাতে কোন শক্তির সাহায্য-সহযোগিতা বিদ্যমান নেই। এই আন্দোলনের নেতা নিজ বংশের দুর্বলতম কয়েকজন লোকের সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত আর কোন শক্তিরই অধিকারী নন। মাত্র কয়েকজন লোক নিজেদের জাতীয় আদর্শ পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাই তাদেরকে সমাজ থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে এই ভাষণ নাযিল হয়। ভাষণের আলোচ্য বিষয়সমূহকে নিম্নলিখিত সাতটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। শিরককে বাতিল ঘোষণা করে তাওহীদ বিশ্বাসের দিকে আহ্বান।

২। পরকাল বিশ্বাসের প্রচার এবং এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু, এ ধারণার প্রতিবাদ।

৩। জাহিলী যুগের লোকদের মনে বদ্ধমূল অমূলক ধারণা-খেয়ালের প্রতিবাদ।

৪। সমাজ গঠনের জন্য ইসলামের উপস্থাপিত নৈতিক মূলনীতিগুলো শিক্ষাদান।

৫। নবী (সা) ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তিসমূহের জওয়াব।

৬। দীর্ঘ দিনের সাধনা-সংগ্রামের পরও আন্দোলন ফলপ্রসূ না হওয়ার দরুন ইসলামপন্থীদের মনে যে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও মনভাঙ্গাজনিত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল, সে সম্পর্কে শান্ত্বনা দান।

৭। বিরুদ্ধবাদী ও ইসলামে অবিশ্বাসী লোকদের উপেক্ষা, অবহেলা ও অজ্ঞতা প্রসূত আত্মহত্যামূলক নীতি অবলম্বনের দরুন তাদেরকে সাবধান করা ও ভীত-সন্ত্রস্ত করা।

এই ভাষণের বিষয়বস্তুগুলোর এক একটি ভাগ আলাদা আলাদাভাবে একই স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে বলার স্টাইলে পেশ করা হয়নি। বরং ভাষণ চলেছে নদীর স্রোতের মতো মুক্ত অবাধ বেগে, আর তার স্রোত বেগের মধ্যে বিষয়বস্তুর শিরোনামগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ভেসে উঠেছে এবং প্রতিবারই নবতর ধরনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

মক্কী যিন্দেগীর কয়েক পর্যায়

একটি দীর্ঘ মক্কী সূরার বিষয়বস্তু সর্বপ্রথম পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হলো। সুতরাং এখানে মক্কী সূরাগুলোর ঐতিহাসিক পটভূমির এক বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। এরপর পরবর্তী পর্যায়ের মক্কী সূরাগুলোর ব্যাপারে যে সকল কথা সামনে আসবে তা বুঝতে সহজ হবে।

মাদানী সূরাগুলোর অধিকাংশই নাযিলের সময়কাল আমাদের জানা আছে বা কিছু চেষ্টা করলে সহজেই জানা যায়। এমনকি কোন কোন সূরার আয়াতের আলোচনায় নাযিলের সময়কাল, কারণ ও উপলক্ষ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়। মাক্কী সূরাগুলোর আলোচ্য বিষয়, বর্ণনা পদ্ধতি ও পটভূমির ব্যাপারে ঐতিহাসিক আলোচনা কম। তাই অধিকাংশ সূরার অভ্যন্তরে যে ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে তার উপর নির্ভর করতে হয়। তাই এ সময় ইশারা

ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে আমরা সিদ্ধান্ত দিতে পারি না যে, এটি অমুক তারিখে অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভুলভাবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, একদিকে আমরা মক্কী সূরাগুলোর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং অপরদিকে নবী করীম (সা)-এর মক্কী জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে কোন্ সূরা কোন্ পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল, সে সম্বন্ধে একটি মতামত পেশ করা যায়।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি অনুসরণ করে নবী করীম (সা)-এর মক্কী জীবনকে ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য চারটি ভাগে বিভক্ত বলে দৃশ্যমান হয়।

প্রথম ভাগ : নবুয়াতের সূচনা থেকে ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এ সময় গোপনে ব্যক্তি বিশেষকে দাওয়াত দেয়া হয়। মক্কায় সাধারণ লোকেরা এ সময় পর্যন্ত কিছুই জানতো না।

দ্বিতীয় ভাগ : নবুয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা থেকে অত্যাচার, নির্যাতন ও উৎপীড়ন শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রায় দুই বছর। এই সময় থেকেই বিরোধিতা শুরু হয় এবং প্রতিরোধের রূপ নেয়। ক্রমে তা ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অপবাদ আরোপ, গালিগালাজ, মিথ্যা প্রচারণা ও বিরোধী দল গঠন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেসব মুসলমান গরীব, দুর্বল ও আত্মীয়-বান্ধবহীন ছিল, তারাই সর্বাধিক নির্যাতনের শিকার হয়।

তৃতীয় ভাগ : অত্যাচার, উৎপীড়নের সূচনা (৫ম নববী সন) থেকে আবু তালিব ও হযরত খাদীজা (রা)-র ইন্তেকাল (১০ম নববী সন) পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর। এ সময় বিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করে। অনেক মুসলমান মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। নবী করীম (সা) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং অবশিষ্ট মুসলমানগণের সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছেদ তাঁদের করে আবু তালিব গিরি সংকটে অবরুদ্ধ করা হয়।

চতুর্থ ভাগ : দশম নববী সন থেকে ত্রয়োদশ সন পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এই সময়টি নবী করীম (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের জন্য অতি দুঃখ-কষ্ট ও

বিপদের সময়। মক্কায় নবী করীম (সা)-এর জীবন অত্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠে। তিনি তায়েফ গিয়েও কোন আশ্রয় পেলেন না। হজ্জের সময় তিনি আরবের এক এক কবিলার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, কিন্তু কোথাও তেমন কোন সাড়া পেলেন না।

অপরদিকে মক্কাবাসীরা পরামর্শ করতে লাগলো যে, নবী করীম (সা)-কে হত্যা, বন্দী অথবা লোকালয় থেকে বহিষ্কার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা মদীনার আনসারদের হৃদয়-মন ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। মদীনার আনসারদের আহ্বানে নবী করীম (সা) মদীনায় হিজরত করলেন।

এই পর্যায়সমূহের মধ্যে এক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা, অপর পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা থেকে আলোচ্য বিষয়, বর্ণনাভংগী ও পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন ধরনের। প্রত্যেক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে নাযিলকৃত সূরাসমূহে বিদ্যমান। এইসব আলামত ও নিদর্শনের উপর নির্ভর করে মক্কী সূরাগুলোর দারসে কোনটি কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে তা ঐ সূরার ভূমিকায় বা ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হবে।

ব্যাখ্যা : (১৬১) قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"বল (হে মুহাম্মদ) আমার মালিক আমাকে অবশ্যই ঠিক পথ দেখিয়েছেন। একান্ত সঠিক নির্ভুল দীন। এটাই হচ্ছে ইবরাহীমের একনিষ্ঠ পথ যাকে সে একাগ্রচিত্তে একমুখী হয়ে গ্রহণ করে ছিল এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

একে ইবরাহীম (আ)-এর পদ্ধতি বলা হয়েছে। একে মূসা ও ঈসা (আ)-এর পদ্ধতিও বলা যেতো। কিন্তু মানুষ ইহুদীবাদকে মূসা (আ)-এর এবং খৃস্টবাদকে ঈসা (আ)-এর আনীত বিধান বলে আখ্যায়িত করে রেখেছে। তাই বলা হয়েছে ইবরাহীমের পদ্ধতি। ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় ধর্মাবলম্বী হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সত্যানুসারী বলে স্বীকার করে এবং তারা একথাও জানে যে, ইহুদী ও খৃস্টবাদের জন্মের অনেক আগেই হযরত

ইবরাহীমের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আরবের মুশরিকরাও তাঁকে সত্যপন্থী পূর্বপুরুষ বলে স্বীকার করতো। নিজেদের অজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা এতটুকু স্বীকার করতো যে, কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী পাক পবিত্র ব্যক্তি মূর্তি পূজারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক আল্লাহর অনুগত বান্দা মুসলিম জাতির পিতা।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ. (১৬২)

"বল, আমার নামায, আমার ইবাদতের সমস্ত অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছু রব্বুল আলামীনের জন্য।"

এ আয়াতে আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মকভাবে একমুখী হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। হৃদয়ের প্রতিটি ভাবান্তর, জীবনের প্রতিটি কাজ, নামায, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যু, আনুষ্ঠানিক ইবাদত ও বাস্তব জীবন, মৃত্যু ও তার পরবর্তী সকল কর্মকাণ্ড সহকারে আল্লাহ্র প্রতি একমুখী হওয়ার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে।

এ আয়াতটিকে পূর্ণাংগ তাওহীদের প্রতীক বলা যায়। এটি আল্লাহর পূর্ণাংগ ইবাদত, দাসত্ব এবং পূর্ণ তাওহীদের অংগীকারনামা বিশেষ। এতে নামায, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যুকে একসাথে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে সর্বময় কর্তা আল্লাহর নিকট এমনভাবে আত্মসমর্পণের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যেন নিজ সত্তার ও জীবনের কণামাত্র অংশও আল্লাহর আনুগত্য থেকে বাদ না যায়। সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।"

এটি আল্লাহর সাথে বান্দার একটি চুক্তি। যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী বান্দার জীবনের মালিক এখন আর বান্দা নিজে নয়, আবার তার সম্পদের মালিকও সে নিজে নয়, সে শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানতদার, তাই বান্দা আলোচ্য সূরা আন'আমের ১৬২ আয়াতের মাধ্যমে তার স্বীকৃতি প্রদান করে। বান্দা বলে :

اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য।"

لاَ شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. (১৬৩)

"তার কোন শরীক নেই। আর এ কথা (বলার জন্যই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী।"

اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ দ্বারা ঐ উম্মতের প্রথম মুসলমান বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ-এর পূর্ববর্তী সকল নবী ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন। প্রকৃত ইসলাম হচ্ছে আল্লাহকে ইলাহ বলে মেনে নেয়া এবং তাঁকে এক ও লা শারীক (অংশীবিহীন) বলে সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নেয়া।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ط وَلاَ تَكْسِبُ (১৬৪) كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا ج وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ج ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ.

"বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন রবের সন্ধান করবো, অথচ তিনিই সকল কিছুর মালিক? প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করে, সেজন্য সেই দায়ী। কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে। তিনি তোমাদের মতবিরোধের স্বরূপ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন।"

এখানে আসমান-জমিনের মাঝে জীব-জড়, গোপন ও প্রকাশ্য যত প্রাণী ও

পদার্থ আছে, সেই সবকিছুর প্রভু ও প্রতিপালক হলেন আল্লাহ। তাদেরকে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও আইন-বিধান সবকিছুর দিক দিয়েই আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীন করা হয়েছে।

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে রব কিভাবে মানব? আমার মনের প্রতিটি ইচ্ছা ও অংগ-প্রতংগের প্রতিটি কর্মের জন্য তাঁর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। সৎ ও অসৎ কাজ যাই করি তার জন্য হিসাব দিতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তি নিজের গুনাহের জন্য দায়ী এবং অন্য কেউ তার দায়িত্ব বহন করবে না।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (১৬৫)

"তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের যা দিয়েছেন সে সম্পর্কে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি অতি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

মানুষকে এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি, শারীরিক আকৃতি, শক্তি ও সম্পদে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন যাতে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে কৃতজ্ঞ আর কে অকৃতজ্ঞ। তিনি শাস্তিদানে অতি কঠোর, আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমাও করতে পারেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

শিক্ষা : ১। আমাদের প্রতিপালক নিঃসন্দেহে আমাদেরকে সঠিক, সম্পূর্ণ ও সর্বোতভাবে নির্ভুল দীন দেখিয়েছেন। এ হচ্ছে ইবরাহীম (আ)-এর দীন, যা তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিলেন।

২। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু বিশ্বজাহানের মালিকের জন্য, যাঁর কোন শরীক নেই।

৩। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। একজনের দায় অপরজনকে বহন করতে হবে না।

৪। আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে এ যমীনে তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়েই তাদের পরীক্ষা করবেন।

বাস্তবায়ন : আখেরী নবীর (সা) মাধ্যমে আমরা যে সত্য দীনের সন্ধান পেয়েছি, তাই ছিল ইবরাহীম (আ)-এর দীন। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিনিধি হিসাবে আমরা দীনের দায়িত্ব পালন করবো এবং আমাদের সমাজ ও প্রতিবেশীদেরকে এ পথে আসার জন্য আহ্বান জানাব। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

দারস : ৮

শাহাদাতের মর্যাদা ও ঈমানের পরীক্ষা

২. সূরা আল-বাকারা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২৮৬, রুকূ-৪০

আলোচ্য আয়াত নং- ১৫৩-১৫৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٥٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ. (١٥٤) وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاۤءٌ وَّلٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ. (١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ. (١٥٦) الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ. (١٥٧) اُولٰۤئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (১৫৩) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জান না। (১৫৫) আর নিশ্চয় আমরা ভয়, ক্ষুধা, ধন-প্রাণ ও

ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো। আর এ অবস্থায় যারা ধৈর্যধারণ করে এবং (১৫৬) যখনই কোন বিপদ আসে তখন বলে ঃ আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (১৫৭) এদের উপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী।

শব্দার্থ : يَاَيُّهَا - ওহে, اسْتَعِيْنُوْا - তোমরা সাহায্য চাও, بِالصَّبْرِ - ধৈর্য সহকারে, الصَّلٰوةِ - নামায দ্বারা, مَعَ - সাথে, الصّٰبِرِيْنَ - ধৈর্যশীলদের, تَقُوْلُوْا - তোমরা বলো, لِمَنْ - যারা, يُقْتَلُ - নিহত হয়, سَبِيْلِ - পথে, اَمْوَاتٌ - তারা মৃত, بَلْ - বরং, اَحْيَاءٌ তারা জীবিত, وَلٰكِنْ - কিন্তু, تَشْعُرُوْنَ - তোমরা অনুভব কর, لَنَبْلُوَنَّكُمْ - তোমাদের অবশ্যই আমরা পরীক্ষা করবো, بِشَىْءٍ - কিছু জিনিস দিয়ে, مِنَ - থেকে, اَلْخَوْفِ - ভয়, সন্ত্রাস, الْجُوْعِ - ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, نَقْصٍ - ক্ষয়ক্ষতি, الاَمْوَالِ - ধনসম্পদের, الاَنْفُسِ - জীবনের, الثَّمَرٰتِ- ফল-ফসল, بَشِّرِ - সুসংবাদ দাও, اَصَابَتْهُمْ - তাদের উপর এসে পড়ে, مُصِيْبَةٌ - বিপদ, اِلَيْهِ - তাঁরই দিকে, رٰجِعُوْنَ - প্রত্যাবর্তনকারী, اُولٰئِكَ - ঐসব লোক, عَلَيْهِمْ - তাদের উপর, صَلَوٰتٌ- বিপুল অনুগ্রহ, مِّنْ - পক্ষ হতে, رَبِّهِمْ - তাদের প্রভুর, رَحْمَةٌ- দয়া, الْمُهْتَدُوْنَ - সঠিক পথগামী।

নামকরণ : এই সূরার ৬৭ নং আয়াত وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط - "যখন মূসা তাঁর জাতিকে বললো, আল্লাহ্ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন।"

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈল জাতিকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতের বাকারা শব্দটিকেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বাকারা মানে গাভী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের

অধিকাংশ সূরার শিরোনামের পরিবর্তে আলামত স্বরূপ নাম রেখেছেন। এখানেও আলবাকারা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরার বেশীর ভাগ অংশ মাদানী যিন্দেগীর প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। সুদ নিষিদ্ধকরণ আয়াতগুলো তাঁর যিন্দেগীর একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়। যে আয়াতগুলো দ্বারা সমাপ্তি হয়েছে, সেগুলো হিজরতের পূর্বে মক্কী যুগে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের ক্রমধারার সাথে মিল রেখেই এভাবে সাজানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : ঐতিহাসিক পটভূমি ভাল করে বুঝে না নিলে এ সূরাকে সহজে বুঝা সম্ভব হবে না।

(১) হিজরতের পূর্বে ইসলামী দাওয়াতের কথা সাধারণত মক্কার মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। তাদের নিকট ইসলামের এই বাণী ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। হিজরতের পর ইসলামের দাওয়াত ইহুদীদের সম্মুখীন হলো। তারা হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবের অনুসারী হয়ে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ওহী ও ফেরেশতায় বিশ্বাসী ছিল। বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে এবং নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা তাওরাতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে তার সাথে মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। তারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, কোন প্রকার সংস্কার সংশোধন নিয়ে যদি কেউ অগ্রসর হতো তবে তারা তাঁকে দুশমন মনে করে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত সহস্র বছর ধরে এই একই ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে।

দীন বহির্ভূত বিষয়গুলো দীনের মধ্যে শামিল, ছোটখাট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহ্‌কে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। মুসলিম নাম ভুলে গিয়ে নিছক ইহুদী নামের

মধ্যেই তারা নিজেদেরকে ধরে রেখেছিল। ১৫ ও ১৬ রুকূতে ইহুদীদের সমালোচনা করে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার মুকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পেশ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মুকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

(২) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের একটি নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতির প্রচার এবং দীন গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের মধ্যেই দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল।

হিজরতের পর মদীনায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন আল্লাহ তায়ালা সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় মৌলিক নির্দেশ জারী করতে থাকেন। ইসলামের ভিত্তির উপর নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পন্থাও বলে দিলেন।

(৩) হিজরতের পূর্বে কাফেরদের ঘরেই ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছিল। যেসব লোক দাওয়াত গ্রহণ করছিল, তারা নিজ নিজ স্থান থেকেই দাওয়াতী কাজ করতো এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নির্মম অত্যাচার ও যুলুম-পীড়ন ভোগ করতো। কিন্তু হিজরতের পর বিক্ষিপ্ত মুসলিমগণ যখন একত্র হয়ে ক্ষুদ্রায়তন একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো, তখন একদিকে এই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র, আর অপরদিকে সমগ্র আরবদেশ একত্র হয়ে তার ধ্বংসের চেষ্টায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিল। তখন এই মুষ্টিমেয় সংখ্যাবিশিষ্ট দলের সাফল্য ও অস্তিত্ব নির্ভর করতে লাগলো প্রধানত পাঁচটি কাজের উপর।

এক– পূর্ণ শক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও হেকমতের সাথে দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে ইসলামের অনুসারী করার চেষ্টা করা।

দুই– বিরোধীরা ভ্রান্ত পথের অনুসারী, বিষয়টি তাদের এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোন বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে।

তিন– তারা আশ্রয়হীন, প্রবাসী ও সমগ্র দেশের শত্রুতা ও প্রতিকূলতার

মুখোমুখী হওয়ার দরুন দারিদ্র্য, উপবাস এবং সর্বদা অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার অস্বস্থিকর অবস্থার শিকার হয়েও তারা হতাশ না হয়ে পূর্ণ ধৈর্যসহকারে এই প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করে এবং তাদের সংকল্পে কোনরূপ দুর্বলতা প্রবেশ করতে দেয় না।

চার– ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে কোন দিক থেকে সশস্ত্র আক্রমণের মুকাবিলা করার জন্য ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে তাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। বিরোধী পক্ষের জনসংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।

পাঁচ– ঈমানদারদের মধ্যে এমন সুদৃঢ় সাহস ও হিম্মত জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে আরববাসীরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে আপোষে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলী ব্যবস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে দ্বিধা-সংকোচ করবে না।

আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তায়ালা এই পাঁচটি কাজের প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে মুনাফিকের দল আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। নবী করীম (সা)-এর মক্কী যিন্দেগীর শেষের দিকে মুনাফিকির প্রাথমিক আলামত লক্ষ্য করা যায়।

(ক) মক্কার মুনাফিকের স্বরূপ ছিল এমন– তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু ইসলামের খাতিরে কোন ত্যাগস্বীকার করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর আরও অনেক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী মুনাফিক দল ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইসলামী দলে প্রবেশ করতো।

(খ) দ্বিতীয় মুনাফিক দলের অবস্থা এই ছিল যে, ইসলামী কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে

একদিকে ইসলাম ও অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের অংশ ভোগ করতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপটা থেকেও রক্ষা পেতো।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ছিল। তাদের বংশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করায় তারাও বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করতো, কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করে ইসলামের নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে তাদের মন চাইতো না।

মহান আল্লাহ এই সূরায় তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছেন। পরবর্তী কালে তাদের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা : (ক) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ (١٥٣)

"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

মদীনায় ছোটখাট একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর সেখানকার ইসলামী সরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বিধান দেয়া হচ্ছে। সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এই কথাটির প্রতি যে, তোমাদের এ দায়িত্ব পালনের একটি বিরাট, মহান ও বিপদে ভরপুর বোঝা তোমাদের মাথায় তোমরা চাপিয়ে নিয়েছো। এই বোঝা মাথায় নেয়ার সাথে সাথেই চারিদিক থেকে বিপদ মুসিবত আসতে থাকবে। অগণিত ক্ষতির দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। ধৈর্য, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সকল বিপদ-আপদের মুকাবিলা করে যখন তোমরা আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে থাকবে তখনই তোমাদের উপর বর্ষিত হবে তাঁর অনুগ্রহরাশি।

কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য তোমাদের দু'টো আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে– সবর ও ধৈর্যের শক্তি লালন করতে হবে। আর দ্বিতীয়টি নামাযের মাধ্যমে নিজেদেরকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে ধৈর্য ও নামায। এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ .

"তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নিশ্চয় ওটা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন।"

মূলত সবর ব্যতীত অন্যান্য গুণাবলীও অর্জন করা সম্ভব নয়। সবরই হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। আল্লাহ্ তায়ালা সবরকেই সমস্ত গুণাবলীর উপর স্থান দিয়েছেন। এভাবে নামায সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা আছে। নামায মুমিন ব্যক্তি ও সমাজকে মহান কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলে। নামাযের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অতি নিকটে পৌছায়। ধৈর্যশীল ছাড়া নিয়মিত নামায আদায় সম্ভব নয়। বান্দা যখন সিজদারত অবস্থায় তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ বান্দাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। এইজন্য বলা হয়েছে, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য কামনা কর।

(খ) وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ. (١٥٤)

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পার না।"

মৃত্যু শব্দটি মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুর কথা শুনলে মানুষ সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তিগণকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরন্তন জীবন লাভ করে। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, শহীদগণের আত্মা সবুজ রংগের পাখী হয়ে বেহেশতের মধ্যে শুভেচ্ছা

বিলিয়ে বেড়ায়। বেহেশতের নাজ-নিয়ামত দেখে নিজেদেরকে ধন্য মনে করে। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এখন তোমরা কি চাও?' তখন তারা বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, পৃথিবীতে আবার গিয়ে আপনার পথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করে ফিরে আসি এবং শাহাদাতের দ্বিগুন মর্যাদা লাভ করি। প্রভু বলেন, এটা হতে পারে না। মৃত্যুর পর কেউই আর দুনিয়ায় ফিরে যাবে না।

বলা হচ্ছে যে, ১. শহীদগণ মৃত্যু যন্ত্রণা হতে মুক্ত। ২. শহীদগণ মৃত্যুর সময় বেহেশতের বালাখানা দেখতে দেখতে খুশীতে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন। ৩. শহীদের রক্ত পবিত্র, তাই তাদের গোসল দেয়ার প্রয়োজন হয় না। ৪. শহীদদের শরীর কবরে অবিকল থাকে। ৫. শহীদদের কবরের আযাব নেই। ৬. শহীদগণ নিকট আত্মীয় থেকে সত্তরজনকে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে বেহেশতে নিয়ে যেতে পারবে। ৭. শহীদগণ শাহাদাতের মর্যাদা ও পুরস্কার দেখে দুনিয়ায় এসে আবার শহীদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবে।

(গ) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ. (١٥٥)

"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো ভয়-ভীতি, অনাহার, তোমাদের জান, মাল ও ফসলাদির ক্ষতি দ্বারা, তুমি ঐসব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দান করো।"

প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির ঈমান পরখ করার জন্য কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। বিপদ-মুসিবত দিয়েই এসব পরীক্ষা করা হয়। আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকার জন্য প্রশিক্ষণ দান করা হয়। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের কঠিন দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর খেলাফত দানের ওয়াদা দিয়েছেন। অলস ও দুর্বল বিশ্বাসের লোকেরা কষ্ট ও ত্যাগ দেখলেই পিছিয়ে যায় এবং সহজেই ভেংগে পড়ে।

অতএব তাদের দ্বারা অন্য কোন যিম্মাদারী পালন সম্ভব নয়। যারা আল্লাহর

পথে যত বেশী ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত, তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক যোগ্য। ধৈর্যের সাথে আল্লাহর পরীক্ষায় যারা টিকে থাকতে পারে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সুসংবাদ দিয়েছেন।

(ঘ) الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ لا قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ـ (١٥٦)

"যখনই তাদের সম্মুখে কোন বিপদ-মুসিবত এসে হাজির হয়, তখনই তারা বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

আমরা যখন আল্লাহর মালিকানায় আছি, তখন তিনি তাঁর জিনিস যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খরচ বা ব্যবহার করবেন, এতে আমাদের আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই। এই অনুভূতির মধ্য দিয়ে কোন বান্দা যখন তার অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে বলে, আয় আল্লাহ! আমার জান-মাল তোমার দান এবং তোমার পথে খরচ হওয়াতেই আমি সন্তুষ্ট। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে যখন তোমার নিকট ফিরে যাব, তখন তোমার মেহেরবানী লাভে ধন্য হবো। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারীদেরকেই আল্লাহ তায়ালা সুসংবাদ দিয়েছেন।

(ঙ) اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ. (١٥٧)

"তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে এবং এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।"

নিজের জান-মাল নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হবে এবং এরাই আল্লাহর হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা : ১। আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ গুণ ধৈর্য ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবো।

২। আল্লাহ তায়ালা শাহাদাতের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে তাঁর রাস্তায়

জেহাদ করে শহীদ হওয়ার প্রতি ঈমানদার লোকদের উৎসাহিত করেছেন। আমরা শহীদী আবেগ নিয়ে আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার-প্রসার করবো।

৩। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের কঠিন দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য আল্লাহ তায়ালা বিভিন্নভাবে ঈমানদারদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। আমাদের জীবনেও এ ধরনের পরীক্ষা আসতে পারে।

৪। আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে। এ বিশ্বাসের উপর যারা আমল করে এবং ধৈর্যধারণ করে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং তারাই সুফল প্রাপ্ত।

বাস্তবায়ন : এই দারসে ঈমানদারদের ঈমানের পরীক্ষা ও শাহাদাতের মর্যাদার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এবং আমাদের সমাজে যারা ঈমানের দাবি করি, তারা সকলে যেন ঈমানের পরীক্ষায় টিকে থেকে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করছি। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ্‌।

দারস : ৯

আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারীদের রয়েছে উচ্চতর মর্যাদা

৪৭. সূরা মুহাম্মাদ

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-৩৮, রুকূ-৪

আলোচ্য আয়াত নং- ৭-১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. (٨) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ. (٩) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ. (١٠) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ز وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا. (١١) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لاَ مَوْلٰى لَهُمْ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (৭) "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করো তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করবেন। (৮) আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য ধ্বংস নিশ্চিত এবং তিনি তাদের কর্ম পণ্ড করে দিবেন।

(৯) কেননা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করে দিবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে সেসব লোকের পরিণাম দেখে না, যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর কাফেরদের জন্যও অনুরূপ পরিণাম নির্ধারিত হয়ে আছে। (১১) এর কারণ- আল্লাহ তো ঈমান গ্রহণকারীদের অভিভাবক, আর কাফেরদের কোন অভিভাবকই নেই।"

শব্দার্থ : اِنْ - যদি, تَنْصُرُوْا - তোমরা সাহায্য কর, يَنْصُرْ তিনি সাহায্য করবেন, يُثَبِّتْ - সুদৃঢ় করবেন, اَقْدَامَكُمْ - তোমাদের অবস্থান, فَتَعْسًا - সে ক্ষেত্রে দুর্গতি, اَضَلَّ - তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন, اَعْمَالَهُمْ - তাদের কর্মসমূহ, اَفَلَمْ - নাই তবে কি, يَسِيْرُوْا - তারা ভ্রমণ করে, الْاَرْضِ - পৃথিবীতে, فَيَنْظُرُوْا - তারা দেখে, كَيْفَ - কেমন, كَانَ - ছিল, عَاقِبَةُ - পরিণাম, قَبْلِهِمْ - তাদের পূর্বে, دَمَّرَ - ধ্বংস করে দিয়েছেন, عَلَيْهِمْ - তাদের উপর, لِلْكٰفِرِيْنَ - কাফেরদের জন্য, اَمْثَالُهَا - তার সমপরিণতি, ذٰلِكَ - এটা, بِاَنَّ - এ জন্য যে, مَوْلٰى - অভিভাবক, اَنَّ - যে (এও), لَهُمْ - তাদের জন্যে।

নামকরণ : এই সূরার দুই নং আয়াতের অংশ- وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ থেকে এর নাম مُحَمَّدٌ - গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : সূরার বিষয়বস্তু, ৪ নং আয়াতের শব্দাবলী এবং যে পূর্বাপর প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকেও একথা স্পষ্ট জানা যায় যে, আয়াতটি যুদ্ধের নির্দেশ আসার পর, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। "যখন কাফেরদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হবে" কথাটিও ইংগিত দেয় যে, তখনও মুকাবিলা হয়নি, বরং মুকাবিলা হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : এই সূরা নাযিলের সময়ের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, বিশেষভাবে মক্কা নগরীতে এবং সাধারণভাবে সমগ্র আরবদেশে

মুসলমানদেরকে যুলুমের স্বীকার ও নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানানো হয়েছিল। মুসলমানদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছিল। নির্যাতিত মুসলিম জনতা চারদিক হতে মদীনার শান্তিপূর্ণ ভূমিতে একত্র হচ্ছিল। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা এখানেও তাদেরকে নিশ্চিন্তে বসবাস করার সুযোগটুকু দিতেও প্রস্তুত ছিল না। মদীনার ছোট্ট ও স্বল্পায়তন জনপদটি চতুর্দিক থেকে কাফেরদের পরিবেষ্টনে আটকা ছিল। তারা মুসলমানদেরকে নির্মূল করে দিতে উদ্যত হয়েছিল।

মুসলিমদের জন্য এ অবস্থায় দুইটি মাত্র উপায় অবশিষ্ট ছিল। হয় তারা ইসলাম পালন ও অনুসরণ ত্যাগ করে কাফের-মুশরিকদের নিকট আত্মসমর্পণ করবে (যা ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অসম্ভব) অথবা তারা মারার জন্য বা মরার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত করে আরব ভূমিতে ইসলাম থাকবে কি জাহিলিয়াত থাকবে– এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে।

এ সময়ে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ের ও উচ্চতর মানের কাজের পথ দেখালেন যা তাদের জন্য একমাত্র পথ। আল্লাহ্ তায়ালা প্রথমে সূরা হজ্জের ৩৯ নং আয়াতে তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। পরে সূরা বাকারায় ১৯০ নং আয়াতে এর নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায় দিলেন। কিন্তু এ সময় ও এ অবস্থায় যুদ্ধ করার অর্থ ও তাৎপর্য যে কি তা তখন সকলে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন। মদীনায় ছিল মুষ্টিমেয় মুসলমানদের একটি বাহিনী। তারা এক হাজার যোদ্ধা পুরুষ সংগ্রহ করতেও সমর্থ ছিল না। এ অবস্থায় তাদেরকে বলা হচ্ছিল , সমগ্র আরবের জাহিলিয়াতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তরবারি নিয়ে বের হয়ে পড়। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধ করার জন্য যেসব সাজ-সরঞ্জাম অপরিহার্য ছিল, তা মদীনার ন্যায় এক দরিদ্র জনপদের পক্ষে উপোস থেকে খাদ্য বিক্রি করেও সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। এ সময়ও শত শত মুহাজির এমন ছিল যাদেরকে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়নি। আরবের লোকেরা অর্থনৈতিক বয়কট করে তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবার উপক্রম করেছিল।

আলোচ্য অংশের বিষয়বস্তু : এ সূরার প্রথমেই যে দু'টি দলের মধ্যে মুকাবিলার কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি দল সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু অপর দলটি আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যে সত্য নাযিল হয়েছিল তা মেনে নিয়েছিল। এখন আল্লাহ্ তায়ালার সিদ্ধান্ত হলো প্রথম দলটির সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও কাজকর্ম তিনি নিষ্ফল করে দিবেন এবং দ্বিতীয় দলটির অবস্থা সংশোধন করে দিবেন।

তারপর দ্বিতীয় দলটিকে সামরিক বিষয়ে প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে কুরবানী পেশ করার জন্য তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তাদেরকে শান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, ন্যায় ও সত্যের পথে প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তারা ক্রমান্বয়ে আরো অধিক ভাল ফল লাভ করবে।

ব্যাখ্যা : (ক) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য করো তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করবেন।"

কুরআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণকে "আল্লাহকে সাহায্য করা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জীবনের যে পরিসরে আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতা দান করেছেন, সেখানেই তিনি নিজের প্রভুত্ব শক্তি ব্যবহার করে কুফর বা ঈমান, বিদ্রোহ বা আনুগত্য কোন একটির পথ অবলম্বন করার জন্য মানুষকে বাধ্য করেননি। এর পরিবর্তে তিনি যুক্তি ও উপদেশের সাহায্যে মানুষের কাছ থেকে এই স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছেন যে, অস্বীকৃতি, নাফরমানী ও বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তার জন্য নিজের স্রষ্টার

দাসত্ব, আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করাই প্রকৃত সত্য এবং এটিই তার সাফল্য ও নাজাতের পথ। এভাবে প্রচার, উপদেশ ও নসীহতের সাহায্যে মানুষকে সত্য সঠিক পথে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করাই আল্লাহর কাজ। আর যেসব লোক এই কাজে আল্লাহকে সাহায্য করে তাদেরকেই আল্লাহর সাহায্যকারী গণ্য করা হয়। আল্লাহর কাছে মানুষের এটিই সর্বোচ্চ মর্যাদা। নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীতে মানুষ নিছক বান্দা ও গোলামের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে সে আল্লাহর সাহায্যকারী ও সহযোগীর মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

(খ) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ.

"যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে শুধু ধ্বংস। আল্লাহ তাদের কাজ পণ্ড করে দিয়েছেন।" تَعْسًا - হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়া। اَضَلَّ - নিষ্ফল করে দিয়েছেন তাদের আমলসমূহ।

(গ) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ.

"আল্লাহ যে জিনিস নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। অতএব আল্লাহ তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন।" তারা নিজেদের প্রাচীন জাহিলী ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি ও নৈতিক বিকৃতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ যে শিক্ষা নাযিল করেছেন তা তারা অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলসমূহ বরবাদ করে দিয়েছেন।

(ঘ) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ز وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا.

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে সেসব লোকের পরিণাম দেখে না যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এসব কাফেরের জন্যও অনুরূপ পরিণাম নির্ধারিত আছে।"

তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে সেসব লোকের ধ্বংসাবশেষ দেখে না, যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। অর্থাৎ ফেরাউন, কারূন, নমরূদ, শাদ্দাদ ও ছামূদ। এদের ধ্বংসাবশেষ দুনিয়াতে এখনও রেখে দেয়া হয়েছে, মানুষের শিক্ষা লাভের জন্য। আগেকার যুগের কাফেররা যে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়েছিল, এখন যে কাফেররা মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত মানছে না তাদের জন্যও ঠিক অনুরূপ শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে। শুধু দুনিয়ার আযাব দ্বারাই তাদের ধ্বংসের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। আখেরাতেও তাদের জন্য এ ধ্বংস নির্ধারিত হয়ে আছে।

(৬) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَامَوْلٰى لَهُمْ.

"এর কারণ আল্লাহ তো ঈমান গ্রহণকারীদের অভিভাবক, আর কাফেরদের কোন অভিভাবকই নেই।"

মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই। ওহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা) যখন আহত হয়ে কয়েকজন সাহাবীর সাথে পাহাড়ের এক গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বললো- لَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ - "আমাদের আছে উয্যা দেবতা, তোমাদের তো উয্যা নেই।" তখন নবী করীম (সা) সাহাবীদের বললেন ঃ তাকে জবাব দাও- اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَامَوْلٰى لَكُمْ - "আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী আল্লাহ, কিন্তু তোমাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নেই।" নবী করীম (সা)-এর এ জবাবটি এ আয়াত থেকেই গৃহীত।

শিক্ষা : ১। ঈমানদারগণ আল্লাহর সাহায্যকারী হলে, আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী হবেন এবং তাদের অবস্থান মজবুত করে দিবেন।

২। আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাস-অপছন্দ করেছে, তাই আল্লাহ তাদের আমলসমূহ বরবাদ করে দিয়েছেন।

৩। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অত্যাচারী লম্পটদের পরিণাম চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে

আছে। তারা পৃথিবী ভ্রমণ করে সেই সব পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ না করায় তাদের জন্যও অনুরূপ পরিণতি অপেক্ষা করছে।

৪। নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষ নিছক বান্দা বা গোলামের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে সে আল্লাহর সাহায্যকারী ও সহযোগীর মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এই দুনিয়ায় রূহানী ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে আরোহণের এটিই একমাত্র পথ।

বাস্তবায়ন : সমাজে আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য যে যত বেশী চেষ্টা, সংগ্রাম-সাধনা করতে পারবে, সে-ই রুহানী ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে উঠে উচ্চতর মর্যাদা ও মাকামে পৌছে যেতে পারবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে রূহানী ও আধ্যাত্মিক মাকাম হাসিল করার জন্য উত্তম আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

দারস : ১০

সার্বভৌমত্বের গুণাবলী

২. সূরা আল-বাকারা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২৮৬, রুকূ-৪০

আলোচ্য আয়াত নং- ২৫৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٢٥٥) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لاَ تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلاَّ بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلاَ يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। "আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন। তন্দ্রা অথবা ঘুম তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে সুপারিশ করবে ? তাদের অতীত ও ভবিষ্যতের সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউই কিছু আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কর্তৃত্বাসন সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী জুড়ে আছে। এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। আর তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠতম।"

শব্দার্থ : اَللّٰهُ - আল্লাহ, لَا - নাই, اِلٰهَ - ইলাহ ('আল্লাহ' ও 'ইলাহ' শব্দদ্বয়ের বাংলা প্রতিশব্দ নাই। এর তরজমা অবান্তর), اِلَّا - ব্যতীত, هُوَ- তিনি, اَلْحَىُّ - চিরজীবি, اَلْقَيُّوْمُ - চিরস্থায়ী, সর্বসত্তার ধারক, تَاْخُذُهٗ - তাঁকে স্পর্শ করতে পারে, سِنَةٌ - তন্দ্রা, نَوْمٌ - নিদ্রা, اَلسَّمٰوٰتِ - আকাশসমূহ, اَلْاَرْضِ - পৃথিবী, مَنْ - কে, ذَا - সে, اَلَّذِىْ - যে, يَشْفَعُ - সুপারিশ করবে, عِنْدَ - নিকট, هٗ - তাঁর, بِاِذْنِهٖ - তাঁর অনুমতি, يَعْلَمُ - তিনি জানেন, بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ- তাদের সম্মুখে, خَلْفَهُمْ - তাদের পিছনে, يُحِيْطُوْنَ - তারা আয়ত্ত্ব করতে পারে, بِشَيْءٍ - কিছু, عِلْمِهٖ - তাঁর জ্ঞান, بِمَا - যা, شَاءَ - তিনি চান, وَسِعَ - বিস্তৃত, كُرْسِيُّهُ - তাঁর আসন, يَئُوْدُهٗ - ক্লান্ত করে, حِفْظُهُمَا - এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ, اَلْعَلِىُّ - সর্বোচ্চ, اَلْعَظِيْمُ- সুমহান।

নামকরণ : এই সূরার ৬৭ নং আয়াত وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط - "যখন মূসা তাঁর জাতিকে বললো, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন।"

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈল জাতিকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতের বাকারা শব্দটিকেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বাকারা মানে গাভী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার শিরোনামের পরিবর্তে আলামত স্বরূপ নাম রেখেছেন। এখানেও আলবাকারা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরার বেশীর ভাগ অংশ মাদানী যিন্দেগীর প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। সুদ নিষিদ্ধকরণ আয়াতগুলো তাঁর যিন্দেগীর একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়।

যে আয়াতগুলো দ্বারা সমাপ্তি হয়েছে, সেগুলো হিজরতের পূর্বে মক্কী যুগে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের ক্রমধারার সাথে মিল রেখেই এভাবে সাজানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : ঐতিহাসিক পটভূমি ভাল করে বুঝে না নিলে এ সূরাকে সহজে বুঝা সম্ভব হবে না।

(১) হিজরতের পূর্বে ইসলামী দাওয়াতের কথা সাধারণত মক্কার মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। তাদের নিকট ইসলামের এই বাণী ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। হিজরতের পর ইসলামের দাওয়াত ইহুদীদের সম্মুখীন হলো। তারা হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবের অনুসারী হয়ে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ওহী ও ফেরেশতায় বিশ্বাসী ছিল। বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে এবং নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা তাওরাতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে তার সাথে মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। তারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, কোন প্রকার সংস্কার সংশোধন নিয়ে যদি কেউ অগ্রসর হতো তবে তারা তাঁকে দুশমন মনে করে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত সহস্র বছর ধরে এই একই ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে।

দীন বহির্ভূত বিষয়গুলো দীনের মধ্যে শামিল, ছোটখাট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহ্কে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। মুসলিম নাম ভুলে গিয়ে নিছক ইহুদী নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে ধরে রেখেছিল। ১৫ ও ১৬ রুকূতে ইহুদীদের সমালোচনা করে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার মুকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পেশ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মুকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

(২) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের একটি নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো। মক্কায়

তো কেবল দীনের মূলনীতির প্রচার এবং দীন গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের মধ্যেই দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল।

হিজরতের পর মদীনায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন আল্লাহ তায়ালা সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় মৌলিক নির্দেশ জারী করতে থাকেন। ইসলামের ভিত্তির উপর নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পন্থাও বলে দিলেন।

(৩) হিজরতের পূর্বে কাফেরদের ঘরেই ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছিল। যেসব লোক দাওয়াত গ্রহণ করছিল, তারা নিজ নিজ স্থান থেকেই দাওয়াতী কাজ করতো এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নির্মম অত্যাচার ও যুলুম-পীড়ন ভোগ করতো। কিন্তু হিজরতের পর বিক্ষিপ্ত মুসলিমগণ যখন একত্র হয়ে ক্ষুদ্রায়তন একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো, তখন একদিকে এই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র, আর অপরদিকে সমগ্র আরবদেশ একত্র হয়ে তার ধ্বংসের চেষ্টায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিল। তখন এই মুষ্টিমেয় সংখ্যাবিশিষ্ট দলের সাফল্য ও অস্তিত্ব নির্ভর করতে লাগলো প্রধানত পাঁচটি কাজের উপর।

এক– পূর্ণ শক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও হেকমতের সাথে দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে ইসলামের অনুসারী করার চেষ্টা করা।

দুই– বিরোধীরা ভ্রান্ত পথের অনুসারী, বিষয়টি তাদের এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোন বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে।

তিন– তারা আশ্রয়হীন, প্রবাসী ও সমগ্র দেশের শক্রতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখী হওয়ার দরুন দারিদ্র্য, উপবাস এবং সর্বদা অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার অস্বস্থিকর অবস্থার শিকার হয়েও তারা হতাশ না হয়ে পূর্ণ ধৈর্যসহকারে এই প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করে এবং তাদের সংকল্পে কোনরূপ দুর্বলতা প্রবেশ করতে দেয় না।

চার– ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে কোন দিক থেকে

সশস্ত্র আক্রমণের মুকাবিলা করার জন্য ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে তাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। বিরোধী পক্ষের জনসংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।

পাঁচ– ঈমানদারদের মধ্যে এমন সুদৃঢ় সাহস ও হিম্মত জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে আরববাসীরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে আপোষে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলী ব্যবস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে দ্বিধা-সংকোচ করবে না।

আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তায়ালা এই পাঁচটি কাজের প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে মুনাফিকের দল আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। নবী করীম (সা)-এর মক্কী যিন্দেগীর শেষের দিকে মুনাফিকির প্রাথমিক আলামত লক্ষ্য করা যায়।

(ক) মক্কার মুনাফিকের স্বরূপ ছিল এমন– তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু ইসলামের খাতিরে কোন ত্যাগস্বীকার করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর আরও অনেক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী মুনাফিক দল ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইসলামী দলে প্রবেশ করতো।

(খ) দ্বিতীয় মুনাফিক দলের অবস্থা এই ছিল যে, ইসলামী কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে ইসলাম ও অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের অংশ ভোগ করতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপটা থেকেও রক্ষা পেতো।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ছিল। তাদের বংশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করায় তারাও বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করতো, কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করে ইসলামের নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে তাদের মন চাইতো না।

মহান আল্লাহ এই সূরায় তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছেন। পরবর্তী কালে তাদের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা : (ক) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ - "আল্লাহ, এমন এক চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।"

এটি 'আয়াতুল কুরসী' নামে পরিচিত। আয়াতটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। এই আয়াতের অনেক ফযীলাত বর্ণিত আছে। এই আয়াতে যে দশটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে, সেগুলো আল্লাহ ব্যতীত আর কারো মধ্যে নেই, থাকতে পারে না। এই দশটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে যে শক্তি তাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয়। দুনিয়ায় অনেক রাজা-বাদশাহই সার্বভৌম ক্ষমতার দাবি করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে এই দশটি বৈশিষ্ট্যের একটিও বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়।

জল্পনা-কল্পনা, মূর্খতা ও ভাববাদিতার জগতে যত অসংখ্য উপাস্য, ইলাহ ও মাবুদ তৈরী করুক না কেন আসলে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শাসন কর্তৃত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র সেই অবিনশ্বর সত্তার করায়ত্ত, যাঁর জীবন কারো দান নয়, বরং নিজস্ব জীবনী শক্তিতে যিনি স্বয়ং চির ভাস্বর। যাঁর শক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই বিশ্ব জগতের সমগ্র ব্যবস্থাপনা। নিজের এই বিশাল সীমাহীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একাই। তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারে দ্বিতীয় কোন শরীক নেই। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে অথবা তাঁর সাথে শরীক করে আসমান-যমীনের কোথাও আর কাউকে মাবুদ, ইলাহ ও প্রভু হিসাবে স্বীকার করলে তা একটি নিরেট মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এটা আসলে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

(খ) لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ - "নিদ্রা ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।"

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার সত্তাকে যারা নিজেদের দুর্বল অস্তিত্বের মত মনে করে এবং যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত করে, এখানে তাদের চিন্তা ও ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার যদি তন্দ্রা আসে বা তিনি নিদ্রা যান তবে আকাশ ও পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ কিরূপে সম্ভব?

(গ) لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

"পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর।"

এই বিশ্ব চরাচরে যেখানে যা কিছু আছে, সবকিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। তাঁর মালিকানা, কর্তৃত্ব ও শাসন পরিচালনায় কারো একবিন্দু পরিমাণ কর্তৃত্ব নেই। তাঁর পরে বিশ্ব জগতের অন্য যে কোন সত্তার কথাই চিন্তা করা হলে সে অবশ্যই হবে এই বিশ্ব জগতের একটি সৃষ্টি। আর সৃষ্টি হলেই হতে হবে তাকে আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁর বান্দা। তাঁর অংশীদার বা সমকক্ষ হবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

(ঘ) مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ

"এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?"

হাশরের দিন সমস্ত সৃষ্টজীব একে একে তাঁর নিকট উপস্থিত হবে। কেউ এমন নেই যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে। এক শ্রেণীর ভ্রান্ত বিশ্বাসী লোক আছে, যারা ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর দরবারে আমাদের পীর-বুযর্গ ব্যক্তিবর্গ ও নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য সত্তা যাদের বিরাট সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, তারা কোন কথার উপর অটল থেকে তা তারা আদায় করে ছাড়ে। আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে কোন কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম। এখানে ভ্রান্ত বিশ্বাসী লোকের চিন্তা-ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হচ্ছে, আল্লাহর সামনে সেখানে সম্মান ও মর্যাদার তো

কোন প্রশ্নই উঠে না, এমনকি কোন বড় নবী-রাসূল এবং কোন নিকটতম ফেরেশতাও দীন দুনিয়ার মালিকের দরবারে বিনা অনুমতিতে টু শব্দটিও উচ্চারণ করার সাহস রাখে না। সূরা ইনফিতারের ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ.

অর্থাৎ সেদিন এমন হবে যে, কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না। সেদিন হুকুম চলবে একমাত্র আল্লাহর।

সূরা আন-নাবার ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا ط لاَّ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا.

অর্থাৎ সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন, সে ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে।

(ঙ) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج

"মানুষের অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কেও তিনি জানেন।"

মানুষ, জিন, ফেরেশতা বা অন্য কোন সৃষ্টিই হোক না কেন, সবার জ্ঞান পূর্ণ নয়, সীমিত। বিশ্ব জগতের সমগ্র রহস্য কারো দৃষ্টি সীমার মধ্যে নেই। বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা, মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ভাল-মন্দ বুঝার ক্ষমতাও রাখে না। বিশ্বজগতের পরিচালক মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালাই ভাল-মন্দের পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। কাজেই জ্ঞানের মূল উৎস মহান আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত আল-কুরআনের উপর আস্থা স্থাপন করা ব্যতীত মানুষের দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

(চ) وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ

"তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কেউই কিছু আয়ত্ত করতে পারে না।"

আল্লাহর জ্ঞানের ভাণ্ডার অসীম। তিনি কাকে কতটুকু জ্ঞান দান করবেন সেটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আল্লাহর অসীম কর্তৃত্ব বিশ্বজগতের উপর বিরাজমান। তাঁর কর্তৃত্বের মাঝে কেউ শরীক নেই। তাঁর সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তার করার মত ক্ষমতাও কেউ রাখে না। এই বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা, অন্তর্নিহিত কার্যকারণ ও ফলাফলের উপর যাদের জ্ঞান নাই তারা কিভাবে আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে?

(ছ) وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

"তাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে।"

উল্লেখিত 'কুরসী' শব্দটি সাধারণত কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তি অর্থে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যদি ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং সবকে মিলিত করে এক করে দেয়া হয় তবে তা কুরসীর তুলনায় ঐরূপ, যেরূপ জনশূন্য মরু প্রান্তরে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত।

ইবনে জারীর (রহ) হযরত উবাই (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ সাতটি আকাশ কুরসীর মধ্যে এরূপ, যেরূপ ঢালের মধ্যে সাতটি দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)। তাঁর কর্তৃত্ব বিশ্ব জগতব্যাপী।

(জ) وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

"এই দুই (আকাশ ও পৃথিবী)-এর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সুমহান।"

আসমান ও যমীনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী ও অতি দরিদ্র। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। اَللّٰهُ الصَّمَدُ। তিনি ঐশ্বর্যশালী ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তাঁকে হুকুম দেয়ার কেউ নেই, বাধা দেয়ারও কেউ নেই। তাঁর কাজের হিসাব গ্রহণকারী কেউ নেই, বরং তিনি সকলের হিসাব গ্রহণকারী।

আয়াতুল কুরসীতে মহান আল্লাহ তায়ালার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি এমনভাবে পেশ করা হয়েছে, যার নজির আর কোথাও নেই। তাই হাদীসে একে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা : ১। এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তায়ালার সার্বভৌম ক্ষমতার দশটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এই গুণগুলোর একটিও আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো মধ্যে নেই।

২। মানুষের অগ্র-পশ্চাত, ভাল-মন্দের পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন আল্লাহ তায়ালা। কাজেই জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত আল-কুরআনের উপর আস্থা স্থাপন এবং কুরআনের পথে পরিচালিত হওয়া ব্যতীত মানুষের জন্য দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

৩। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার দেয়া আল-কুরআনের পথে আমরা পরিচালিত হব এবং নিজ দেশের ও দুনিয়ার মানুষকে এ পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য হেকমতের সাথে আহ্বান জানাব।

বাস্তবায়ন : এই দারসের শিক্ষণীয় হিসাবে যে তিনটি দফা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সাধ্যানুসারে পুরোপুরি কাজ করা দরকার, তাহলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে।

দারস : ১১

ঈমানের মানদণ্ড

৯. সূরা আত-তাওবা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-১২৯, রুকূ-১৬

আলোচ্য আয়াত নং- ২৩, ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٢٣) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. (٢٤) قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (২৩) "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইদেরকেও নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে ভালবাসে। তোমাদের যে কেউ এই ধরনের লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে-ই হবে যালেম। (২৪) বলো, যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন,

তোমাদের সেই ধনমাল যা তোমরা উপার্জন করেছ, সেই ব্যবসায় যার মন্দা পড়ার তোমরা ভয় কর, আর তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা খুবই পছন্দ কর, এসব তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তো সত্যত্যাগী লোকদের কখনও সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"

শব্দার্থ : (১) يَاَيُّهَا - ওহে, اَلَّذِيْنَ - যারা, اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছ, لَا - না, تَتَّخِذُوْا - তোমরা গ্রহণ করো, اٰبَاءَكُمْ- তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, اِخْوَانَكُمْ - তোমাদের ভাইদেরকে, اَوْلِيَاءَ - অভিভাবকরূপে, اِنِ - যদি, اسْتَحَبُّوْا - তারা ভালবাসে, الْكُفْرَ - কুফরীকে, (২) عَلَى الْاِيْمَانِ - ঈমানের পরিবর্তে, وَ - এবং, مَنْ - যে, يَتَوَلَّهُمْ - তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে, مِنْكُمْ - তোমাদের মধ্য হতে, فَاُولٰئِكَ - তবে ঐসব লোক, الظّٰلِمُوْنَ -। যালেম, (৩) قُلْ - বল, اِنْ - যদি, كَانَ - হয়, اٰبَاؤُكُمْ - তোমাদের বাপ-দাদারা, اَبْنَاؤُكُمْ - তোমাদের সন্তানরা, اِخْوَانُكُمْ - তোমাদের ভাইয়েরা, وَاَزْوَاجُكُمْ - তোমাদের স্ত্রীরা, عَشِيْرَتُكُمْ - তোমাদের স্বজনগোষ্ঠী, اَمْوَالٌ - মালসম্পদ, اقْتَرَفْتُمُوْهَا - যা তোমরা অর্জন করেছ, تِجَارَةٌ - ব্যবসা, تَخْشَوْنَ - তোমরা ভয় কর, كَسَادَهَا - যার মন্দা পড়ার, مَسٰكِنُ - বাসস্থানসমূহ, تَرْضَوْنَهَا - যা তোমরা পছন্দ কর, اَحَبَّ - অধিক প্রিয়, (৪) جِهَادًا - জিহাদ, سَبِيْلِ - রাস্তা বা পথ, فَتَرَبَّصُوْا - তবে তোমরা অপেক্ষা কর, حَتّٰى - যতক্ষণ না, يَاْتِىَ - নিয়ে আসেন, بِاَمْرِهٖ - তাঁর নির্দেশকে, সিদ্ধান্ত, لَا - না, يَهْدِىْ - পথ দেখান, اَلْقَوْمَ - জাতিকে, الْفٰسِقِيْنَ - যারা সত্যত্যাগী।

নামকরণ : এ সূরা দুইটি নামে পরিচিত। প্রথম নাম আত-তওবা আর দ্বিতীয় নাম বারায়াত। এ সূরার এক স্থানে কোন কোন ঈমানদার লোকদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বারায়াত অর্থ

সম্পর্কচ্ছেদ। মুশরিকদের সাথে সম্পর্কছেদের ঘোষণা এ সূরার শুরুতেই করা হয়েছে।

সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ না লেখার কারণ : এ সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম না লেখার বিভিন্ন কারণ তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম রাযী (র) যে কারণটি উল্লেখ করেছেন তাই সঠিক বলে মনে হয়। তাহলো নবী করীম (সা) নিজেই এ সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ লেখাননি। এ কারণে সাহাবায়ে কিরামও তা লেখেননি। পরবর্তী কালের লোকেরাও একই নীতি অনুসরণ করেছেন। কুরআন মজীদকে নবী করীম (সা) থেকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে যে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এটা তার অন্যতম প্রমাণ।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ও সূরার বিভিন্ন অংশ : সূরাটি তিনটি ভাষণে শেষ হয়েছে। প্রথম ভাষণটি সূরার শুরু থেকে ৫ম রুকূর শেষ পর্যন্ত। তা নাযিল হওয়ার সময় হচ্ছে নবম হিজরীর যিলকাদ মাসের নিকটবর্তী কোন সময়। নবী করীম (সা) এ বছর হযরত আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ (হজ্জের অনুষ্ঠান পরিচালক) নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ই ভাষণটি নাযিল হয়। আর তখনই নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর পিছনে পিছনে মক্কায় পাঠালেন যেন হজ্জের সম্মেলনে তা পাঠ করে শুনানো হয় এবং এ ভাষণের আলোচ্য বিষয়ের মর্মানুসারে যে কর্মনীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা যেন সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ষষ্ঠ রুকূর শুরু থেকে ৯ম রুকূর শেষ পর্যন্ত। এটি নবম হিজরীর রজব মাসে বা তার কিছু পূর্বে নাযিল হয়। তখন নবী করীম (সা) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এতে ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদে যোগদানে উৎসাহিত করা হয়। আর যারা মুনাফিকী, ঈমানের দুর্বলতা ও গাফিলতির কারণে আল্লাহর পথে জান-মাল খরচ করতে প্রস্তুত ছিল না তাদেরকে তিরস্কার করা হয়।

তৃতীয় ভাষণটি দশম রুকূ থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলে। এ অংশ তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নাযিল হয়। এতে এমন কতগুলো অংশও রয়েছে যা উক্ত সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। পরে নবী করীম (সা) আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এসব কয়টি ভাষণকে একত্র করে একই ভাষণের ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত করেন। এ অংশ কয়টি একই বিষয় সম্পর্কিত।

এতে মুনাফিকদের তম্বিহ (সতর্ক) করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা যোগদান করেনি তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক সত্যিকারভাবে ঈমানদার থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল, তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এ সূরার বিভিন্ন অংশ নাযিলের ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সর্বশেষে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে তার স্থান সর্বপ্রথম এবং অপর ভাষণ দুইটিকে শেষে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি : ঘটনা পরম্পরার সাথে এ সূরার বিষয়বস্তুর যে সম্পর্ক তার সূচনা হয় হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে। হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ছয় বছরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনা-সংগ্রামের ফল এই হয়েছিল যে, আরবের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংঘবদ্ধ সমাজের বিধান ও ব্যবস্থা, এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়, তখন দীন ইসলাম অপেক্ষাকৃত অধিক শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশে চারিদিকে সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অতঃপর ঘটনার গতি দু'টি বড় পথে চলতে শুরু করে, যার পরিণামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটির সম্পর্ক আরবদেশের সাথে, আর অপরটির সম্পর্ক রোমান সাম্রাজ্যের সাথে। আরবদেশের সাথের পরিণামে মক্কা বিজয়, আর রোমান সাম্রাজ্যের সাথের পরিণামে বিনা যুদ্ধে রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন এলাকা মুসলিমদের প্রভাবাধীন হয়।

ব্যাখ্যা : (ক) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইদেরকেও নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে ভালবাসে। তোমাদের যে কেউ এই ধরনের লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে-ই হবে যালেম।"

আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামায়াতরূপে সাহাবায়ে কেরামের যে জামায়াত গঠিত হয়েছিল, তার মূলে ছিল তাঁদের এ ত্যাগ ও কুরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রা), রোমের হযরত সোহাইব (রা), পারস্যের হযরত সালমান (রা), মক্কার কুরাইশ ও মদীনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছিলেন। ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর পিতা তাঁর সামনে এসে মূর্তির প্রশংসা করতে শুরু করে দেয়। তিনি তাকে বারবার বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বিরত না হলে পিতা-পুত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবু উবায়দা (রা) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ... مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ.

মহানবী (সা) বলেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

"তোমাদের কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও মানুষের চাইতে বেশী প্রিয় হই।" (বুখারী ও মুসলিম)

(খ) قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

"বলো, যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের সেই ধনমাল যা তোমরা উপার্জন করেছ, সেই ব্যবসায় যার মন্দা পড়ার তোমরা ভয় কর, আর তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা খুবই পছন্দ কর– এসব তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ্ তো সত্যত্যাগী লোকদের কখনও সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"

এই সূরার ২৪তম আয়াতটি নাযিল হয় মূলত ওদের ব্যাপারে যারা হিজরতের আদেশ দেয়ার পরও মক্কা থেকে হিজরত করেনি। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ-সম্পদের মায়া হিজরতের নির্দেশ পালনে এদের বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা নবী করীম (সা)-কে নির্দেশ দেন, আপনি তাদের বলে দিন, "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের সে ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা খুব পছন্দ কর– এসব যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর বিধান তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ্ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়কে কখনও সত্য পথের সন্ধান দেন না।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ (র) বলেন,

এখানে 'বিধান' অর্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। বাক্যের মর্ম হলো, যারা দুনিয়াবী সম্পর্কের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর এ সকল নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে, তখন দুনিয়াবী সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, এখানে বিধান অর্থ আল্লাহর আযাবের বিধান। অর্থাৎ আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্র আযাব অতি শীঘ্র তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। অন্যথা আখেরাতের আযাব তো আছেই। সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেয়া হলো। এতেই অনেকের হাঁফ ছেড়ে বাঁচার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জিহাদের আদেশ, যে আদেশ পালনে আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য সকল বস্তুর মায়া, এমনকি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো– وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ - "আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।"

এতে বলা হয় যে, যারা হিজরতের আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং অর্থ-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে, তাদের এ আচরণ দুনিয়াতেও কোন কাজ দিবে না এবং তারা আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ও ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তা পূরণ হওয়ার নয়; বরং জিহাদের দামামা বেজে উঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আল্লাহর রীতি হল, তিনি নাফরমান সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

উপসংহারে বলা যায়, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মনের অভ্যন্তরেও কেনো অংশীদার সহ্য করে না। ইসলামকে একনিষ্ঠভাবেই গ্রহণ করতে হবে। তাই বলে মুসলমানদেরকে তাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদ ও সুখ-আনন্দভোগ ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে– মুমিনদের অন্তরে ইসলামের ভালোবাসা যেন একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ

হয়। একমাত্র এর দ্বারাই যেন সে পরিচালিত ও উদ্বুদ্ধ হয়। এরূপ হলে জীবনের সকল হালাল ও পবিত্র সুখ ও আনন্দ উপভোগ করায় কোনো আপত্তি নেই। তবে পার্থিব সুখ যখন ইসলামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে পুরোপুরিভাবে ছুঁড়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যাবে এভাবে যে, ইসলাম ও বৈষয়িক স্বার্থ– এ দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা অগ্রাধিকার পাচ্ছে। যদি ইসলাম অগ্রাধিকার পায় এবং কোনো মুসলমান যদি নিশ্চিত হয় যে, ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসা ও নিষ্ঠায় কোনো ভেজাল নেই, তাহলে সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিকে উপভোগ করা দোষণীয় নয়। অহংকার ও অপব্যয়-অপচয় ছাড়া হালাল পার্থিব সম্পদ ভোগ করায়ও আপত্তি নেই। বরং তখন আল্লাহ্‌র নিয়ামত ভেবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার মনোভাব নিয়ে উপভোগ করা আরো পুণ্যের কাজ হবে।

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পিতা-মাতা ও ভাই-বোন যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে তাদেরকে প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করো না।...'

ইসলামের দৃষ্টিতে মনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক যেখানে ছিন্ন হবে, সেখানে রক্ত ও বংশের সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র সাথে যখন ঘনিষ্ঠতা থাকবে না, তখন পরিবার-পরিজনের সাথেও ঘনিষ্ঠতা থাকবে না। আল্লাহ্‌র সাথে যে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা, সেটাই সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রথম আত্মীয়তা এবং তাঁর সাথেই সমগ্র মানবজাতি যুক্ত। আল্লাহ্‌র সাথে যদি প্রীতির সম্পর্ক না থাকে, তবে আর কারো সাথেই তা থাকতে পারে না।

'যারা তাদেরকে প্রিয়জন মনে করবে, তারা যালেম।'

এখানে 'যালেম' শব্দ দ্বারা মুশরিক বুঝানো হয়েছে এবং যে আত্মীয় কুফরীকে ঈমানের ওপর স্থান দেয়, সে আত্মীয়কে আত্মীয় হিসাবে গ্রহণ করাই ঈমানের পরিপন্থী।

এখানে শুধু নীতি ও আদর্শই তাত্ত্বিকভাবে বর্ণনা করা হয়নি, বরং বিভিন্ন

প্রকারের সম্পর্ক সম্পদ এবং সুখ ও আনন্দের বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতঃপর এগুলোকে এক পাশে এবং ইসলামী আকীদা, আদর্শ ও তার দাবি অপর পাশে রাখা হয়েছে। এক পাশে রাখা হয়েছে পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, স্ত্রী ও গোত্রকে, রক্ত, বংশ, আত্মীয়তা ও দাম্পত্য সম্পর্কের উপাদান হিসাবে, সহায়-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে স্বভাবসুলভ মোহ ও লোভের উপাদান হিসাবে এবং আরামদায়ক বাড়ী-ঘরকে পার্থিব সুখ ও ভোগের উপকরণ হিসাবে, অপর পাশে রাখা হয়েছে আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতি ভালবাসাকে। আর জিহাদ বলতে জিহাদের সকল দাবি ও সকল দুঃখ-কষ্টকে, সকল ত্যাগ ও বঞ্চনাকে, সকল যখম ও শাহাদতকে এবং সকল যুলুম ও বেদনাকে বুঝানো হয়েছে। এতো সব ত্যাগ ও কষ্টের পরও জিহাদ থেকে যাবে নিরেট 'আল্লাহর পথে জিহাদ' হিসাবে। এর জন্য কোনো খ্যাতি, সুনাম ও প্রচার আশা করা যাবে না, কোনো গর্ব, অহংকার ও প্রদর্শনী করা যাবে না এবং পৃথিবীর কারো প্রশংসা ও অভিনন্দন আশা করা যাবে না। অন্যথা এর কোনো সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যাবে না।

'বলো, যদি তোমাদের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে।... (আয়াত-২৪)

নিঃসন্দেহে এটা খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু তবুও এটা করতেই হবে। আল্লাহর রাসূল ও জিহাদকে দিতে হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। নচেত 'আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করো।' অর্থাৎ ফাসেকদের পরিণতির অপেক্ষা করো। আর ফাসেকদের পরিণতি হলো-

'নিশ্চয় আল্লাহ ফাসেকদের হেদায়াত করেন না।'

এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা শুধু ব্যক্তির কাছ থেকে নয়, বরং সমগ্র মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে। কোনো সম্পর্ক ও স্বার্থকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আল্লাহর পথে জিহাদের দাবির উর্ধ্বে তোলা যাবে না।

এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ মুসলমানদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা একথা জেনেই দিয়েছেন যে, এটা করতে তারা সক্ষম ও সমর্থ, অন্যথা নির্দেশ দিতেন না। কারণ আল্লাহ কারো সাধ্য বহির্ভূত কাজের আদেশ দেন না। এটা মানুষের ওপর আল্লাহর বিরাট করুণা ও

অনুগ্রহ যে, তাদেরকে এতো উচ্চাংগের নিষ্ঠা ও সহনশীলতা দান করেছেন, এই নিষ্ঠাকে তিনি এতো মজাদার বানিয়েছেন যে, পৃথিবীর আর কোনো জিনিস এতো মজাদার নয়। আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার আবেগ ও অনুভূতির মজা, আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশা পোষণ করার মজা এবং পার্থিব হীন স্বার্থের মোহ ও নৈতিক অধঃপতনের উর্ধ্বে ওঠার মজা, এসব মজার সাথে দুনিয়ার আর কোনো মজা, স্বাদ, আনন্দ ও তৃপ্তির কোনো তুলনা হয় না।

শিক্ষা : ১। পিতা-মাতার আনুগত্য করা যাবে না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। তবে তাদের সাথে পার্থিব সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে।

২। দীনি সম্পর্কের উপর দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

৩। আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদকে দুনিয়ার সকল স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

৪। দুনিয়ার সুখ-সুবিধা ও স্বার্থকে পেছনে ফেলে ইকামাতে দীনের দাবিকে অগ্রাধিকার দিলেই ঈমানের দাবি পূরণ হবে।

৫। নাফরমান সম্প্রদায়কে আল্লাহ হেদায়াত দেন না।

বাস্তবায়ন : সূরা তওবার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের শিক্ষাগুলো আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়নের জন্য আমরা যেন মনেপ্রাণে চেষ্টা করি। আল্লাহর সকল আদেশ পালন করে এবং সকল নিষেধ থেকে দূরে থেকে আমরা যেন মুত্তাকী বান্দা হিসাবে আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় হতে পারি সেই তাওফীক কামনা করছি। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ১২

আখেরাতের চিত্রের কিয়দংশ

৯৯. সূরা আয-যিলযাল

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৮, রুকূ-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اِذَا زُلْزِلَتِ الاَرْضُ زِلْزَالَهَا لا (٢) وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا لا (٣) وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ج (٤) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا لا (٥) بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ط (٦) يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ط (٧) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ط (٨) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (১) "যখন পৃথিবী তার নিজস্ব কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) এবং পৃথিবী যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কী হলো? (৪) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ তোমার প্রভু তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হয়ে আসবে, যেন তাদের আমল তাদের দেখানো যায়। (৭) পরন্তু কেউ অণু পরিমাণ নেক আমল করলে সে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ বদ্‌আমল করলে সেও তাও দেখতে পাবে।"

শব্দার্থ : زُلْزِلَتْ - প্রকম্পিত হবে, اَلاَرْضُ - পৃথিবী, زِلْزَالَ - ভীষণ কম্পনে, اَخْرَجَتِ - বের করবে, اَثْقَالَ - বোঝা, اِنْسَانُ - মানুষ, مَا لَهَا - তার কি হয়েছে, يَوْمَئِذٍ - সেদিন, تُحَدِّثُ - সে বর্ণনা করবে, اَخْبَارَهَا - তার বৃত্তান্ত (খবর), بِاَنَّ - কেননা, رَبَّكَ - তোমার প্রভু, اَوْحٰى - ওহী করবেন (তা করার জন্য), يَوْمَئِذٍ - সেদিন, يَّصْدُرُ - ফিরে আসবে, اَلنَّاسُ - মানুষ, اَشْتَاتًا - বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, لِيُرَوْا - তাদের দেখানোর জন্য, اَعْمَالَهُمْ - তাদের আমলসমূহ, فَمَنْ - অতএব যে ব্যক্তি, يَعْمَلْ - আমল করবে, مِثْقَالَ - পরিমাণ, ذَرَّةٍ - অণু, خَيْرًا - ভাল, يَرَهُ - তা সে দেখবে, شَرًّا - মন্দ।

নামকরণ : প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ زِلْزَالَهَا থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে, زِلْزَالْ - অর্থ ভীষণ কম্পন।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়ে মতভেদ আছে। ইবনে মাসঊদ (রা), আতা, জাবির ও মুজাহিদ (র) বলেন, এটি মাক্কী সূরা। ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটা উক্তি এরই সমর্থনে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কাতাদা ও মুকাতিল (র) বলেন, এটা মাদানী সূরা। ইবনে আব্বাস (রা)-এর অপর একটি উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনে আবু হাতিম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, এ সূরার মাদানী হওয়া সম্পর্কে তাকেই দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

উক্ত আয়াত যখন নাযিল হলো তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার আমল দেখবো? নবী করীম (সা) বললেন, হাঁ। আমি বললাম, এটা কি বড় বড় গুনাহ সম্পর্কে? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, ছোট ছোট গুনাহও কি দেখবো? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, তবে তো আমি বড়ই বিপদে পড়বো। নবী করীম (সা) বললেন ঃ সন্তুষ্ট

হও, আনন্দ কর হে আবু সাঈদ! কেননা প্রত্যেকটি নেক আমল তদনুরূপ দশটি নেক আমলের সমান হবে। এ হাদীসের ভিত্তিতে বলা হয় যে, সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে।" তাও এভাবে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) মদীনার অধিবাসী ছিলেন এবং ওহুদের যুদ্ধের পর পূর্ণ বয়স্ক হয়েছেন।

তাঁর কথা হতে বুঝা যায়, সূরাটি যদি তাঁর উপস্থিতিতে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই মাদানী সূরা। কিন্তু আয়াত ও সূরার নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈনের অবলম্বিত নীতির যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে সূরা 'দাহর'-এর ভূমিকায় এসেছে, তার ভিত্তিতে বলা যায়, কোন সাহাবী যদি বলেন, এ আয়াত অমুক অবস্থায়, অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তবে বুঝতে হবে যে, ঠিক সেই সময়ই তা প্রথম নাযিল হয়েছে এটা প্রমাণের জন্য এটা অকাট্য দলীল নয়। কেননা এও তো হতে পারে যে, সূরাটি হয়তো প্রথমে কখনো নাযিল হয়েছে। কিন্তু হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর নবী করীম (সা)-এর মুখে সর্বপ্রথম শুনতে পেয়ে সূরার শেষাংশের আয়াতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং তাকে উক্ত রূপ প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করেন। আর এর বিবরণ দিতে গিয়ে এমনভাবে তা বলেছেন যে, মনে হয় তিনি বলতে চান যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন আমি নবী করীম (সা)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেছিলাম। এ বর্ণনাটি সামনে থাকলে কুরআন বুঝে পড়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই স্পষ্ট বুঝবে যে, এটি মাদানী নয়, মাক্কী সূরা। শুধু তাই নয়, তার বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গী দেখলে তো স্পষ্ট মনে হয়, এটা মাক্কী পর্যায়েরও সেই প্রাথমিক কালে হয়তো নাযিল হয়ে থাকবে। কেননা এতে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতে ইসলামের মৌল আকীদাসমূহ লোকদের সামনে পেশ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং সেখানে দুনিয়ায় সম্পাদিত সমস্ত কাজের হিসাব মানুষের সামনে উত্থাপন করা হবে। সূরার প্রথমদিকে মৃত্যুর পর মানুষের দ্বিতীয় জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হবে এবং এই সূত্রপাত হবে কেমন বিস্ময়কর তা বলা হয়েছে। মানুষ এই পৃথিবীর বুকে নিশ্চিন্তে সব রকমের কাজ করে যাচ্ছে।

সে কোন দিন কল্পনাও করে না যে, এই নিষ্প্রাণ জিনিস কোন দিন তার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহর হুকুমে সেদিন প্রতিটি আমল প্রত্যেক লোকের ব্যাপারে কথা বলতে থাকবে, কোন্ সময় কোথায় সে কি কাজ করেছিল। সেদিন পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিজ নিজ কবর থেকে মানুষ বের হয়ে দলে দলে আসতে থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড পূর্ণাংগ ও বিস্তারিত পেশ করা হবে , সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা বদীও বাদ পড়বে না।

ব্যাখ্যা : (ক) اِذَا زُلْزِلَتِ الاَرْضُ زِلْزَالَهَا - 'যালযালা' - অর্থ পরস্পর প্রবলভাবে ধাক্কা দেওয়া, প্রকম্পিত করা। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা নয়, বরং গোটা পৃথিবী প্রকম্পিত হবে। এ প্রকম্পনের তীব্রতা প্রকাশ করার জন্য অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার হয়েছে- زِلْزَالَهَا - তার প্রকম্পন। গোটা পৃথিবীকে ভয়ংকররূপে কাঁপানো হবে, ধাক্কা দেয়া হবে, নাড়িয়ে, হেলিয়ে ও দুলিয়ে দেয়া হবে। কতিপয় তাফসীরকার মনে করেন, কিয়ামতের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হলে যে 'যালযালা' হবে এটা তাই। কিন্তু মুফাস্‌সিরদের একটা বড় জামায়াত মনে করেন, কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলে যে কম্পন হবে এটা সেই 'যালযালা'। অর্থাৎ যখন আগের পরের সব মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে- এটা সেই সময়ের কথা। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি অধিক সহীহ মনে হয়। কেননা পরবর্তী সকল পরিস্থিতি দ্বিতীয় পর্যায়কেই সমর্থন করে।

(খ) اَثْقَالَهَا - বোঝা, সূরা ইনশিকাক-এর ৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ - "আর যা কিছু তার মধ্যে আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে তা সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে যাবে।" কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, মরা মানুষ মাটির মধ্যে যে রূপে ও যে অবস্থায় পড়ে থাকুক না কেন, পৃথিবী তা সবই বাইরে বের করে দেবে। আর পরবর্তী বাক্য হতে জানা যায়, এ সময় তাদের দেহের সমস্ত অংশ একত্র হয়ে পূর্ববর্তী জীবনের ন্যায় পুনরায় সেই আকার-আকৃতি নিয়ে জীবিত হয়ে উঠবে।

অন্যথা, (গ) وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا - “মানুষেরা বল্‌বে, যমীনের এ কি হয়েছে?” কথাটি তারা কিভাবে বলতে পারে?

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا. بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا.

“সেদিন সে তার উপর সংঘটিত সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ তার প্রভু তাকে এইরূপ করার নির্দেশ দেবেন।”

দ্বিতীয় অর্থ– জমীন কেবল মানুষকে নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হবে না, তাদের পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত কাজকর্ম, কথাবার্তা ও গতিবিধির যে সাক্ষ্য মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে, সে সবকেও তা বাইরে নিক্ষেপ করবে। পরবর্তী বাক্যে তা (নিজের উপর সংঘটিত) সমস্ত অবস্থা বলে দেবে।

তৃতীয় অর্থ– কোন কোন মুফাস্‌সির বর্ণনা করেছেন, সোনা, রূপা, হীরা, মণি-মাণিক্য এবং অন্যান্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূ-গর্ভে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তূপও সেদিন যমীন তার উপরিভাগে নিক্ষেপ করবে। মানুষ দেখবে, এগুলোর জন্য দুনিয়ায় তারা মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে এক একটি সম্প্রদায় ও জাতিকে ধ্বংস করে দিতো। আজ সেসব তাদের পায়ের নীচে উল্টো আযাবের সরঞ্জাম হয়ে রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াতটি পড়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ “জানো, তার সেই অবস্থা কি?” লোকেরা জবাব দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “সেই অবস্থা হচ্ছে যমীনের পিঠে যত মানব-মানবী যে কাজ করছে, যমীন তার সাক্ষ্য দেবে। সে বলবে, এই ব্যক্তি উমুক দিন উমুক কাজ করেছিল। এই হচ্ছে সেই অবস্থা, যা যমীন বর্ণনা করবে।” রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “যমীন থেকে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করো। কারণ এ হচ্ছে তোমাদের মূল ভিত্তি। আর এমন কোন ব্যক্তি নেই যে এর উপর ভাল-মন্দ কোন কাজ করে এবং সে তার কোন খবর দেয় না।” তিনি আরও বলেন, “কিয়ামতের দিন যমীন এমন প্রতিটি কাজ নিয়ে আসবে যা তার উপর করা হয়েছে।”

হযরত আলী (রা) সংক্রান্ত জীবনী গ্রন্থে লিখিত হয়েছে ঃ বায়তুল মালের

সমুদয় সম্পদ যখন তিনি হকদারের মধ্যে বণ্টন করে সব খালি করে দিতেন তখন সেখানে দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে বলতেন, “তোকে সাক্ষ্য দিতে হবে, আমি তোকে সত্যসহকারে ভরেছি এবং সত্য সহকারে খালি করেছি।”

প্রাচীন যুগের মানুষেরা বলতো, যমীন আবার কিভাবে কথা বলবে? কিন্তু আজ জ্ঞান-গবেষণা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং সিনেমা, লাউড স্পীকার, রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার ইত্যাদি আবিষ্কারের এ যুগে যমীন কিভাবে কথা বলবে একথা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। মানুষ তার মুখ থেকে যা কিছু উচ্চারণ করে তার পূর্ণ অবয়ব বাতাসে, রেডিও তরংগে, ঘরের দেয়ালে, মেঝে ও ছাদের প্রতি অণু-পরমাণুতে এবং কোন পথে, কোন ময়দানে বা ক্ষেতে কোন কথা বা কাজ করে থাকলে সেখানকার প্রতিটি অণু-কণিকায় তা গেঁথে আছে। আল্লাহ্ যখনই চাইবেন একথাগুলোকে এসব জিনিসের মাধ্যমে তখনই হুবহু শুনিয়ে দিতে পারবেন, যেভাবে সেগুলো একদিন মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। সে সময় মানুষ নিজের কানেই নিজের আওয়াজ শুনে নেবে। পরিচিত জনেরাও শুনে তারই কণ্ঠধ্বনি বলে শনাক্ত করবে। মানুষ যমীনের যেথায় যে কাজ করেছে, তার প্রতিটি নড়াচড়া ও অংগভংগির প্রতিচ্ছবি আশপাশের বস্তুতে চিত্রায়িত হয়ে আছে। কালো আঁধারের বুকে সে কোন কাজ করে থাকলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীন এমন সব রশ্মি রয়েছে তারা সকল অবস্থায় তার ছবি তুলতে পারে। এমন সব ছবি কিয়ামতের দিন একটি সচল ফিল্মের মতো মানুষের সন্মুখে উপস্থিত হয়ে যাবে এবং জীবনের আদ্যপান্ত সে কোথায় কি করেছে তা তাকে দেখানো হবে।

মানুষের কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তায়ালা সরাসরি জানলেও আখেরাতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবি পুরাপুরি পালন করেই শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে। সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তার আমলনামা। সব সময় তার সাথে লেগে থাকা কিরামান-কাতেবীন (সম্মানিত লেখকদ্বয়) তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ রেকর্ড করেছেন। (সূরা কাফ ঃ ১৭ আয়াত; ইনফিতার ঃ ১০-১২ আয়াত)

এ আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে। তাকে বলা হবে, তোমার জীবনের এই কার্যবিবরণী পড়ো। নিজের হিসাব নেবার জন্য আজ তুমি নিজেই যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৪)

মানুষ তার আমলনামা পড়ে অবাক হয়ে যাবে। কারণ ছোট বড় এমন কোন বিষয় নেই যা তাতে যথাযথভাবে সংযোজিত হয়নি। এরপর হচ্ছে মানুষের নিজের শরীর। দুনিয়ায় এ শরীরের সাহায্যে সে সমস্ত কাজ করেছে।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. (سورة يس : ٦٥)

"আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৫)

আল্লাহর আদালতে তার মুখ বন্ধ করে অন্যান্য অংগ-প্রতঙ্গের সাক্ষ্য নেয়া হবে, কে কি কাজ করেছে। মানুষের মনে যেসব চিন্তা, ইচ্ছা, সংকল্প ও উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল এবং যে অভিপ্রায়ে সে নিজের সমস্ত কাজ করেছিল, তাও সামনে এনে রেখে দেয়া হবে। এসব জ্বলজ্যান্ত ও চূড়ান্ত প্রমাণ সামনে এসে যাবার পর মানুষ অবাক ও নির্বাক হয়ে যাবে। ওজর পেশ করার কোন সুযোগই তার থাকবে না। (দ্র. আল-মুরসালাত ঃ ৩২-৩৬)

(ঘ) يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ.

"সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হয়ে আসবে, যেন তাদের আমল তাদের দেখানো যায়।"

যেদিন শিংগায় ফুক দেয়া হবে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে মানুষ আসতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী অবস্থান করবে। পরিবার, গোষ্ঠী, দল, জাতি সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সেদিন মহান আল্লাহ বলবেন, "এখন তুমি এমনিতেই একাকী আমার সামনে হাজির হয়েছ, যেমনি আমি প্রথমবার তোমাকে একাকী সৃষ্টি করেছিলাম।"

তাদের আমলনামা তাদেরকে দেখানো হবে। কোন কোন জায়গায় বলা

হয়েছে, তাদের আমলনামা তাদের হাতে দিয়ে বলা হবে, "আজ তোমাদের আমলনামা পড়ার জন্য তোমরাই যথেষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৪)

হকপন্থীদের উপর বাতিলপন্থীদের যুলুম এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতসমূহের দৃশ্যাবলী হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকেরা নিজেদের চোখেই দেখতে পাবে।

(৬) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

"তারপর যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।"

মানুষের অণু পরিমাণ নেকী বা পাপও তার আমলনামায় লিখিত হবে। নেকীর জন্য পুরস্কার আর পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের লোকদের পুরস্কার ও শাস্তির একটি বিস্তারিত ধরন বর্ণনা করা হয়েছে।

এক. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের কর্মকাণ্ড (নেকী) নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। প্রতিদান যা দুনিয়াতেই পাবে, আখেরাতে পাবে না। (দ্র. সূরা আরাফ ঃ ১৪৭; সূরা তাওবা-১৭, ৬৭-৬৯)

দুই. পাপ যতটুকু করা হয় শাস্তি ততটুকু দেয়া হবে। কিন্তু নেকীর প্রতিদান দশ গুণ, আবার আল্লাহ নিজের ইচ্ছামত বাড়িয়ে দেবেন। (দ্র. সূরা বাকারা ঃ ২৬১; সূরা আনআম ঃ ১৬০, সূরা নূর ঃ ৩৮)

তিন. মুমিন ব্যক্তি যদি বড় বড় গুনাহ থেকে দূরে থাকে, তাহলে তার ছোট গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে। (দ্র. সূরা নিসা ঃ ৩১; সূরা শূরা ঃ ৩৭; সূরা নাজম ঃ ৩২)

চার. সৎ মুমিনের কাছ থেকে হালকা হিসাব নেয়া হবে। তার গুনাহগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হবে। তার ভাল ও উত্তম আমলগুলোর দৃষ্টিতে বিচার করে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। (দ্র. সূরা আনকাবূত ঃ ৭; সূরা যুমার ঃ ৩৫; সূরা আহকাফ ঃ ১৬; সূরা ইনশিকাক ঃ ৮)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আহার করছিলেন। এমন সময় সেই আয়াতটি

নাযিল হয়। হযরত আবু বকর (রা) আহার থেকে হাত গুটিয়ে নেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ আমি করেছি, তার ফলও কি আমি দেখে নেবো? জবাব দেন ঃ হে আবু বকর! দুনিয়ায় যেসব বিষয়েরই তুমি সম্মুখীন হও, তার মধ্যে যেগুলো তোমার নিকট অপছন্দনীয় ও অপ্রীতিকর ঠেকে সেগুলোই তুমি যেসব অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করেছো তার বদলা এবং যেসব অণু পরিমাণ নেকীর কাজই তুমি কর সেগুলো আল্লাহ আখেরাতে তোমার জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন।" এই আয়াত সম্পর্কে তিনি আবু আইউব আনসারীকেও বলেছিলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নেকী করবে তার পুরস্কার সে আখেরাতে পাবে। আর যে খারাপ কাজ করবে বিপদ-আপদ ও রোগের আকারে এই দুনিয়ায় তার শাস্তি পেয়ে যাবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন, "আল্লাহ মুমিনের প্রতি যুলুম করেন না। দুনিয়ায় তার নেকীর প্রতিদানে তাকে রিযিক দান করেন এবং আখেরাতে আবার এর পুরস্কার দেবেন। আর কাফেরের ব্যাপারে দুনিয়ায় তার সৎ কাজের প্রতিদান দিয়েছেন, তারপর যখন কিয়ামত হবে তখন তার আমলনামায় কোন নেকী লেখা থাকবে না। (ইবনে জারীর)

মাসরূক হযরত আয়েশা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন জাহেলী যুগে আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করতো, মিসকীনকে আহার করাতো, মেহমানদের আপ্যায়ন করতো, বন্দীদের মুক্তি দান করতো। আখেরাতে এগুলো কি তার জন্য উপকারী হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দেন, "না, সে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত একবারও বলেনি, رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ। (হে আমার রব, শেষ বিচারের দিন আমার ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দিও)।" কাজেই তার আযাব হবে, তবে হাতেম তাই-এর মত দানশীলতার কারণে তাকে হালকা আযাব দেয়া হবে।

শেষের এ আয়াত মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ব্যাপারে সজাগ করে দেয়। সেটি হচ্ছে, প্রত্যেকটি সামান্যতম কাজেরও, তা যত ছোটই হোক না

কেন, অবশ্যই হিসাব হবে। তাই কোন ছোট সৎ কাজকে ছোট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের অনেক ছোট সৎ কাজ মিলে আল্লাহর দরবারে একটি বড় সৎ কাজ গণ্য হতে পারে।

নবী করীম (সা) বলেছেন, "তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো– তা এক টুকরো খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার বিনিময়ে হলেও।"

শিক্ষা : ১। মানুষকে তার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ আখেরাতের জীবনের প্রারম্ভেই দিতে হবে।

২। হিসাব-নিকাশের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মানুষের মুখ বন্ধ করে তার অংগ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেয়া হবে, যে স্থানে ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার মাটি, আসবাবপত্র, চারিদিকের অণু-পরমাণু সাক্ষ্য দিবে। কিরামান কাতেবীনের লিখিত আমলনামা সাক্ষ্য দিবে।

৩। অণু পরিমাণ সৎ বা অসৎ কর্ম হিসাব থেকে বাদ পড়বে না। সৎ কাজের পুরস্কার ও অসৎ কাজের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বাস্তবায়ন : এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা অস্থায়ী দুনিয়ার মানুষের কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ নেয়ার জন্য হাশরের দিন বিচারের ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ তায়ালা যার হিসাব শক্তভাবে ধরবেন তার কোন উপায় থাকবে না। তাই আমাদের সকলেই আল্লাহর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করা উচিত, তিনি যেন দয়া করে আমাদের হিসাবকে সহজভাবে গ্রহণ করেন। اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا - "হে আল্লাহ! আমার থেকে হিসাব তুমি সহজ করে নাও।" আল্লাহ তায়ালার নিকট এই আবেদন রেখে এখানেই দারস শেষ করছি। আমীন ॥ ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ১৩

আরবের বাইরে ইসলামের সম্প্রসারণ

৯. সূরা আত-তাওবা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-১২৯, রুকূ-১৬

আলোচ্য আয়াত নং- ৩৮, ৩৯, ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٣٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ. (٣٩) اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا لا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (٤٠) اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (৩৮) "হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হলো? যখন তোমাদের বলা হলো, আল্লাহর পথে বেরিয়ে এসো তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরলে। তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট? অথচ আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন অতি নগণ্য। (৩৯) তোমরা অভিযানে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করবেন, আর তোমরা তাঁর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৪০) তোমরা তাকে সাহায্য না করলেও আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে নির্বাসিত করেছিল এবং গুহায় দু'জনের তিনি ছিলেন দ্বিতীয়, যখন তারা উভয়ে গুহায় অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি তার সঙ্গীকে বললেন, চিন্তিত হয়োও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গী। আল্লাহ তাকে শান্তনা দিলেন এবং এমন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। আল্লাহ কাফেরদের কথা হেয় করলেন। আল্লাহর বাণীই সর্বোচ্চ। আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।"

শব্দার্থ : مَالَكُمْ - তোমাদের কি হয়েছে, اِذَا - যখন, قِيْلَ - বলা হলো, لَكُمْ - তোমাদেরকে, اِنْفِرُوْا - তোমরা বের হও, فِىْ سَبِيْلِ - পথে, اللّٰهِ - আল্লাহর, اِثَّاقَلْتُمْ - তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লে, اِلَى - উপর, الْاَرْضِ - যমীনের, اَرَضِيْتُمْ - তোমরা পরিতুষ্ট হয়েছ কি, بِالْحَيٰوةِ - জীবন নিয়ে, اَلدُّنْيَا - দুনিয়ার, مِنَ - পরিবর্তে, الْاٰخِرَةِ - আখেরাতের, فَمَا - অথচ নয়, مَتَاعُ - ভোগসামগ্রী, اَلْحَيٰوةِ - জীবনের, اَلدُّنْيَا - দুনিয়ার, فِىْ - তুলনায়, اَلْاٰخِرَةِ - আখেরাতের, اِلاَّ - যদি না, تَنْفِرُوْا - তোমরা বের হও, يُعَذِّبْكُمْ - তোমাদের তিনি আযাব দিবেন, عَذَابًا - আযাব, اَلِيْمًا - বড় কষ্টদায়ক, يَسْتَبْدِلْ - পরিবর্তন করে, (আনবেন), قَوْمًا - এক জাতিকে, غَيْرَكُمْ - তোমাদের ব্যতীত, لاَتَضُرُّوْهُ - তোমরা তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না, شَيْئًا - কিছুমাত্র, قَدِيْرٌ - ক্ষমতাবান, اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ - যদি না তোমরা তাকে সাহায্য কর, فَقَدْ -

নিশ্চয়ই, نَصَرَهُ - তিনি তাকে সাহায্য করেছেন, اَخْرَجَهُ - তাঁকে বহিষ্কার করে ছিল, ثَانِيَ - দ্বিতীয়, اثْنَيْنِ - দু'জনের, هُمَا - তারা দু'জনে, الْغَارِ - গুহায়, يَقُوْلُ - সে বলেছিল, لِصَاحِبِهٖ - তার সাথীকে, لاَ تَحْزَنْ - তুমি ভয় পেয়ো না, مَعَنَا - আমাদের সাথে আছেন, فَاَنْزَلَ اللّٰهُ - আল্লাহ তখন নাযিল করলেন, سَكِيْنَتَهُ - তাঁর প্রশান্তি, وَاَيَّدَهُ - তাঁকে সাহায্যও দিলেন, بِجُنُوْدٍ - (এমন সব) সৈন্য দিয়ে, لَمْ تَرَوْهَا - যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি, جَعَلَ - করলেন, كَلِمَةَ - বাণীকে, كَفَرُوْا - যারা কুফরী করেছিল, اَلسُّفْلٰى - নীচু, اَلْعُلْيَا - সমুন্নত, عَزِيْزٌ - মহাপরাক্রমশালী, حَكِيْمٌ - মহাবিজ্ঞ।

নামকরণ : এ সূরা দুইটি নামে পরিচিত। প্রথম নাম আত-তওবা আর দ্বিতীয় নাম বারায়াত। এ সূরার এক স্থানে কোন কোন ঈমানদার লোকদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বারায়াত অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। মুশরিকদের সাথে সম্পর্কছেদের ঘোষণা এ সূরার শুরুতেই করা হয়েছে।

সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ না লেখার কারণ : এ সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম না লেখার বিভিন্ন কারণ তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম রাযী (র) যে কারণটি উল্লেখ করেছেন তাই সঠিক বলে মনে হয়। তাহলো নবী করীম (সা) নিজেই এ সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ লেখাননি। এ কারণে সাহাবায়ে কিরামও তা লেখেননি। পরবর্তী কালের লোকেরাও একই নীতি অনুসরণ করেছেন। কুরআন মজীদকে নবী করীম (সা) থেকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে যে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এটা তার অন্যতম প্রমাণ।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ও সূরার বিভিন্ন অংশ : সূরাটি তিনটি ভাষণে শেষ হয়েছে। প্রথম ভাষণটি সূরার শুরু থেকে ৫ম রুকূর শেষ পর্যন্ত। তা নাযিল হওয়ার সময় হচ্ছে নবম হিজরীর যিলকাদ মাসের

নিকটবর্তী কোন সময়। নবী করীম (সা) এ বছর হযরত আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ (হজ্জের অনুষ্ঠান পরিচালক) নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ই ভাষণটি নাযিল হয়। আর তখনই নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর পিছনে পিছনে মক্কায় পাঠালেন যেন হজ্জের সম্মেলনে তা পাঠ করে শুনানো হয় এবং এ ভাষণের আলোচ্য বিষয়ের মর্মানুসারে যে কর্মনীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা যেন সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ষষ্ঠ রুকূর শুরু থেকে ৯ম রুকূর শেষ পর্যন্ত। এটি নবম হিজরীর রজব মাসে বা তার কিছু পূর্বে নাযিল হয়। তখন নবী করীম (সা) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এতে ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদে যোগদানে উৎসাহিত করা হয়। আর যারা মুনাফিকী, ঈমানের দুর্বলতা ও গাফিলতির কারণে আল্লাহর পথে জান-মাল খরচ করতে প্রস্তুত ছিল না তাদেরকে তিরস্কার করা হয়।

তৃতীয় ভাষণটি দশম রুকূ থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলে। এ অংশ তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নাযিল হয়। এতে এমন কতগুলো অংশও রয়েছে যা উক্ত সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। পরে নবী করীম (সা) আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এসব কয়টি ভাষণকে একত্র করে একই ভাষণের ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত করেন। এ অংশ কয়টি একই বিষয় সম্পর্কিত।

এতে মুনাফিকদের তম্বিহ (সতর্ক) করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা যোগদান করেনি তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক সত্যিকারভাবে ঈমানদার থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল, তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এ সূরার বিভিন্ন অংশ নাযিলের ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সর্বশেষে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে তার স্থান সর্বপ্রথম এবং অপর ভাষণ দুইটিকে শেষে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি : ঘটনা পরম্পরার সাথে এ সূরার বিষয়বস্তুর যে সম্পর্ক তার সূচনা হয় হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে। হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ছয় বছরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনা-সংগ্রামের ফল এই হয়েছিল যে, আরবের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংঘবদ্ধ সমাজের বিধান ও ব্যবস্থা, এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়, তখন দীন ইসলাম অপেক্ষাকৃত অধিক শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশে চারিদিকে সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অতঃপর ঘটনার গতি দু'টি বড় পথে চলতে শুরু করে, যার পরিণামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটির সম্পর্ক আরবদেশের সাথে, আর অপরটির সম্পর্ক রোমান সাম্রাজ্যের সাথে। আরবদেশের সাথের পরিণামে মক্কা বিজয়, আর রোমান সাম্রাজ্যের সাথের পরিণামে বিনা যুদ্ধে রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন এলাকা মুসলিমদের প্রভাবাধীন হয়।

আলোচ্য অংশের বিষয়বস্তু : আরবে ইসলামের ভূমিকা পূর্ণত্ব লাভের পর দ্বিতীয় পর্যায় হলো– আরবের বাইরে দীন ইসলামের প্রভাব-বলয়কে সম্প্রসারিত করা। এই ব্যাপারে রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্যের রাষ্ট্রীয় শক্তি পর্বত প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই এই শক্তিসমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ছিল একান্তই অনিবার্য। অবশ্য পরে অপরাপর অমুসলিম রাষ্ট্র ও তামাদ্দুনিক শক্তির সাথেও এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে মুসলমানদের নির্দেশ প্রদান করা হল যে, আরবের বাইরে যেসব লোক দীন ইসলামের অনুসারী ও অনুগত নয় তাদের স্বাধীন শাসন কর্তৃত্বকে শক্তির জোরে খতম করতে হবে, যতক্ষণ না তারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে স্বীকার করে, তার অধীনতা কবুল করতে প্রস্তুত হয়। অবশ্য দীন ইসলামের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে তাদের ইচ্ছাধীন। আল্লাহর যমীনে নিজেদের স্বেচ্ছাচারী আইন বিধান চালু করার এবং আল্লাহর বান্দাদের স্বাধীনতা হরণ করার, নিজেদের সমস্ত গোমরাহীকে

জনসাধারণের উপর এবং তাদের বংশধরদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকার তাদের থাকতে পারে না। তাদেরকে যতটুকু স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে তাহলো, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে চাইলে থাকতে পারে; কিন্তু তাদের জন্য শর্ত এই যে, জিযিয়া দিয়ে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

ব্যাখ্যা : (ক) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ. (٣٨)

"হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হলো? যখন তোমাদের বলা হলো, আল্লাহর পথে বেরিয়ে এসো তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরলে। তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট? অথচ আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন অতি নগণ্য।"

এখান থেকে তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে অবতীর্ণ ভাষণটি শুরু হয়েছে। এই আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, আখেরাতের অনন্ত জীবন ও অসংখ্য নেয়ামত যখন তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে, তখন তোমরা জানতে পারবে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় অস্থায়ী জীবনকালে স্বাদ-ভোগ-বিলাসের যে বৃহত্তর সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলে এবং সর্বাধিক বিলাস ব্যসনের তোমরা মালিক হয়েছিলে, তা এই চিরস্থায়ী পরজগতের সীমাসংখ্যাহীন নেয়ামতে ভরা বিরাট রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয়। তখন তোমরা বুঝতে পারবে, তোমরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। আল্লাহর কালামের উপদেশ অগ্রাহ্য করে আখেরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, এখন এই বিপুল ও চিরন্তন সুযোগ-সুবিধা ও ভোগবিলাস থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবল আফসোস করা ব্যতীত আর কিছুই করার থাকবে না।

দ্বিতীয় অর্থটি হলো, দুনিয়ার জীবনে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী তোমাদের শেষ

নিঃশ্বাসের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কবরে তোমাকে খালি হাতেই যেতে হবে। সেখানে দুনিয়ার নেয়ামতের কোন অংশ তোমরা যদি পেতে চাও, তবে শুধু তাই পাবে, যা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করবে।

(খ) اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا لا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَتَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ (٣٩)

"তোমরা অভিযানে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করবেন, আর তোমরা তাঁর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

যুদ্ধের জন্য ডাক পড়লে তাতে যোগদান করতে হয়। তবে এ ডাক দুই প্রকার– সাধারণভাবে এই ডাকে সাড়া দেয়া অপরিহার্য। আর সাধারণভাবে ডাক না দিয়ে যদি শ্রেণী ভিত্তিক কিছু লোককে ডাকা হয় তবে শুধু তাদের জন্য তা অপরিহার্য। এতে কিছু লোককে যুদ্ধে যোগদান করলেই সকলের কর্তব্য আদায় হয়ে যাবে। ফরযে আইনের বেলায় যদি কোন লোক প্রকৃত অক্ষমতা ব্যতীত তাতে যোগদানে বিরত থাকে, তবে তাকে ঈমানদার বলে গণ্য করা যাবে না।

আল্লাহ্ কারো উপর নির্ভরশীল নহেন। তিনি তোমাদেরকে তাঁর দীনের খেদমত করার জন্য সুযোগ দিচ্ছেন, এটাই তাঁর অসীম অনুগ্রহ। এখন যদি তোমরা তোমাদের অজ্ঞতার কারণে এই মহা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হও, তবে আল্লাহ্ তায়ালা অপর কোন জাতিকে এ কাজের তাওফীক দান করবেন, আর তোমরা ব্যর্থ হয়ে পড়ে থাকবে।

(গ) اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (٤٠)

“তোমরা তাকে সাহায্য না করলেও আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে নির্বাসিত করেছিল এবং গুহায় দু'জনের তিনি ছিলেন দ্বিতীয়, যখন তারা উভয়ে গুহায় অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি তার সঙ্গীকে বললেন, চিন্তিত হয়োও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গী। আল্লাহ তাকে শান্ত্বনা দিলেন এবং এমন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। আল্লাহ কাফেরদের কথা হেয় করলেন। আল্লাহর বাণীই সর্বোচ্চ। আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।”

মক্কার কাফেররা যে রাতে নবী করীম (সা)-কে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল এবং তিনি সেই রাতেই মক্কা হতে বাহির হয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেন– এখানে ঠিক সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে। মুসলমানগণ দু'চারজন করে বিপুল সংখ্যক পূর্বেই মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মক্কায় কেবল তারাই থেকে গিয়েছিল, যারা ছিল সর্বোতভাবে সহায়-সম্বলহীন। তাই তাদের উপর কোন ভরসা করা যাচ্ছিল না। এরূপ অবস্থায় যখন নবী করীম (সা) জানতে পারলেন যে, তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তখন তিনি তাঁর সাথী হযরত আবু বকর (রা)-কে সংগে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। অবশ্যই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করা হবে– এই ভেবে তিনি উত্তর দিকগামী মদীনার পথ অবলম্বন না করে দক্ষিণে যাওয়ার পথ ধরলেন। এ পথে তিনি 'সাওর' পর্বতের গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করে থাকেন। এদিকে রক্ত পিপাসু শত্রুরা তাঁকে চারিদিকে অনুসন্ধান করতে থাকে। এ সময় কিছু লোক তাঁর অবস্থানস্থল ঐ গুহার একেবারে মুখের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। তখন হযরত আবু বকর (রা) খুবই ভীত ও শংকিত হয়ে পড়েন। নবী করীম (সা) বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি বরং হযরত আবু বকর (রা)-কে শান্ত্বনা দিলেন এই বলে, “চিন্তা করো না, ভয় পেয়ো না, আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন।”

শিক্ষা : ১। যেসব লোক দীন ইসলামের অনুসারী ও অনুগত নয়, তাদের স্বাধীন শাসন কর্তৃত্বকে শক্তির জোরে খতম করতে হবে, যতক্ষণ না তারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে স্বীকার করে, তার অধীনতা কবুল করতে প্রস্তুত

হয়। অবশ্য দীন ইসলামের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে তাদের ইচ্ছাধীন।

২। আল্লাহর যমীনে নিজেদের স্বেচ্ছাচারী আইন চালু করার এবং আল্লাহর বান্দাদের স্বাধীনতাকে নিজেদের করায়ত্ব করে নিজেদের সমস্ত গোমরাহীকে জনসাধারণের এবং তাদের বংশধরদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকার তাদের নাই।

৩। অবিশ্বাসীদেরকে যতটুকু স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে তাহলো, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে চাইলে থাকতে পারে। তবে তার জন্য শর্ত এই যে, জিযিয়া দিয়ে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

বাস্তবায়ন : সূরা তাওবার ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নং আয়াতের দারসের শিক্ষাগুলো কাজে লাগিয়ে অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যেও আমরা ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কাজ করে আমাদের ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রকে মজবুতি দানে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারি। আল্লাহ আমাদের এই তাওফীক দান করুন। আমীন!!

দারস : ১৪

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও শয়তানের রাস্তা ত্যাগ

২. সূরা আল-বাকারা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২৮৬, রুকূ-৪০

আলোচ্য আয়াত নং- ২০৮, ২০৯, ২১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٢٠٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. (٢٠٩) فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (٢١٠) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ.

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (২০৮) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (২০৯) তোমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট হেদায়াত আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২১০) তারা কি এই প্রতীক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছায়া দিয়ে ফেরেশতাদের বিপুল জমায়েত সংগে নিয়ে তাদের সামনে এসে যাবেন এবং তখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে? সমস্ত ব্যাপার তো আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

শব্দার্থ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - হে ঈমানদারগণ, اُدْخُلُوْا - তোমরা প্রবেশ কর, فِىْ - মধ্যে, السِّلْمِ - ইসলামের, كَافَّةً - সম্পূর্ণভাবে, وَلَا - এবং না, تَتَّبِعُوْا - তোমরা অনুসরণ কর, خُطُوٰتِ - পদাঙ্কসমূহ, الشَّيْطٰنُ - শয়তানের, اِنَّهٗ - সে নিশ্চয়, لَكُمْ - তোমাদের জন্য, عَدُوٌّ - শত্রু, مُبِيْنٌ - প্রকাশ্য, فَاِنْ - অতএব যদি, زَلَلْتُمْ - তোমাদের পদস্খলন হয়, مِنْۢ بَعْدِ - (এর) পরেও, مَا - যা, جَاءَتْكُمْ - তোমাদের কাছে এসেছে, الْبَيِّنٰتُ- সুস্পষ্ট হেদায়াত, فَاعْلَمُوْا - তবে তোমরা জেনে রাখ, اَنَّ - নিশ্চয়, اللّٰهَ - আল্লাহ, عَزِيْزٌ - মহাপরাক্রমশালী, حَكِيْمٌ - মহাবিজ্ঞ, هَلْ - কি, يَنْظُرُوْنَ - তারা অপেক্ষা করছে, اِلَّاً - এছাড়া, اَنْ - যে, يَاْتِيَهُمْ - তাদের কাছে আসবেন, ظُلَلٍ - ছায়া, الْغَمَامِ - মেঘমালা, الْمَلٰئِكَةُ - ফেরেশতারা, قُضِىَ - ফয়সালা হয়ে যাবে, الْاَمْرُ - সব কাজের, تُرْجَعُ - প্রত্যাবর্তিত হবে, الْاُمُوْرِ - সব ব্যাপার।

নামকরণ : এই সূরার ৬৭ নং আয়াত وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط - "যখন মূসা তাঁর জাতিকে বললো, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন।"

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈল জাতিকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতের বাকারা শব্দটিকেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বাকারা মানে গাভী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার শিরোনামের পরিবর্তে আলামত স্বরূপ নাম রেখেছেন। এখানেও আলবাকারা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরার বেশীর ভাগ অংশ মাদানী যিন্দেগীর প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। সুদ

নিষিদ্ধকরণ আয়াতগুলো তাঁর যিন্দেগীর একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়। যে আয়াতগুলো দ্বারা সমাপ্তি হয়েছে, সেগুলো হিজরতের পূর্বে মক্কী যুগে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের ক্রমধারার সাথে মিল রেখেই এভাবে সাজানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : ঐতিহাসিক পটভূমি ভাল করে বুঝে না নিলে এ সূরাকে সহজে বুঝা সম্ভব হবে না।

(১) হিজরতের পূর্বে ইসলামী দাওয়াতের কথা সাধারণত মক্কার মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। তাদের নিকট ইসলামের এই বাণী ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। হিজরতের পর ইসলামের দাওয়াত ইহুদীদের সম্মুখীন হলো। তারা হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাত কিতাবের অনুসারী হয়ে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ওহী ও ফেরেশতায় বিশ্বাসী ছিল। বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে এবং নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা তাওরাতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে তার সাথে মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। তারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, কোন প্রকার সংস্কার সংশোধন নিয়ে যদি কেউ অগ্রসর হতো তবে তারা তাঁকে দুশমন মনে করে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত সহস্র বছর ধরে এই একই ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে।

দীন বহির্ভূত বিষয়গুলো দীনের মধ্যে শামিল, ছোটখাট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহ্কে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। মুসলিম নাম ভুলে গিয়ে নিছক ইহুদী নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে ধরে রেখেছিল। ১৫ ও ১৬ রুকূতে ইহুদীদের সমালোচনা করে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার মুকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পেশ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মুকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

(২) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের একটি নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতির প্রচার এবং দীন গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের মধ্যেই দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল।

হিজরতের পর মদীনায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন আল্লাহ্ তায়ালা সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় মৌলিক নির্দেশ জারী করতে থাকেন। ইসলামের ভিত্তির উপর নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পন্থাও বলে দিলেন।

(৩) হিজরতের পূর্বে কাফেরদের ঘরেই ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছিল। যেসব লোক দাওয়াত গ্রহণ করছিল, তারা নিজ নিজ স্থান থেকেই দাওয়াতী কাজ করতো এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নির্মম অত্যাচার ও যুলুম-পীড়ন ভোগ করতো। কিন্তু হিজরতের পর বিক্ষিপ্ত মুসলিমগণ যখন একত্র হয়ে ক্ষুদ্রায়তন একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো, তখন একদিকে এই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র, আর অপরদিকে সমগ্র আরবদেশ একত্র হয়ে তার ধ্বংসের চেষ্টায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিল। তখন এই মুষ্টিমেয় সংখ্যাবিশিষ্ট দলের সাফল্য ও অস্তিত্ব নির্ভর করতে লাগলো প্রধানত পাঁচটি কাজের উপর।

এক– পূর্ণ শক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও হেকমতের সাথে দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে ইসলামের অনুসারী করার চেষ্টা করা।

দুই– বিরোধীরা ভ্রান্ত পথের অনুসারী, বিষয়টি তাদের এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোন বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে।

তিন– তারা আশ্রয়হীন, প্রবাসী ও সমগ্র দেশের শত্রুতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখী হওয়ার দরুন দারিদ্র্য, উপবাস এবং সর্বদা অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার অস্বস্থিকর অবস্থার শিকার হয়েও তারা হতাশ না হয়ে পূর্ণ ধৈর্যসহকারে এই প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করে এবং তাদের সংকল্পে কোনরূপ দুর্বলতা প্রবেশ করতে দেয় না।

চার– ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে কোন দিক থেকে সশস্ত্র আক্রমণের মুকাবিলা করার জন্য ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে তাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। বিরোধী পক্ষের জনসংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।

পাঁচ– ঈমানদারদের মধ্যে এমন সুদৃঢ় সাহস ও হিম্মত জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে আরববাসীরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে আপোষে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলী ব্যবস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে দ্বিধা-সংকোচ করবে না।

আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তায়ালা এই পাঁচটি কাজের প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে মুনাফিকের দল আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। নবী করীম (সা)-এর মক্কী যিন্দেগীর শেষের দিকে মুনাফিকির প্রাথমিক আলামত লক্ষ্য করা যায়।

(ক) মক্কার মুনাফিকের স্বরূপ ছিল এমন– তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু ইসলামের খাতিরে কোন ত্যাগস্বীকার করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর আরও অনেক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী মুনাফিক দল ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইসলামী দলে প্রবেশ করতো।

(খ) দ্বিতীয় মুনাফিক দলের অবস্থা এই ছিল যে, ইসলামী কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে ইসলাম ও অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের অংশ ভোগ করতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপটা থেকেও রক্ষা পেতো।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ছিল। তাদের বংশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করায় তারাও বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর মুনাফিক, যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করতো, কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করে ইসলামের নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে তাদের মন চাইতো না।

মহান আল্লাহ এই সূরায় তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছেন। পরবর্তী কালে তাদের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : ঈমানদারগণকে পুরোপুরি ইসলামের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান থেকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। মানুষের নিকট সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হেদায়াত আসার পরও ভুল করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ বলে সতর্ক করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়ায় যে যা-ই করুক না কেন, সমস্ত ব্যাপার শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হবে।

ব্যাখ্যা : (ক) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ط إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না। নিশ্চয় সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।"

কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই, কোনরূপ কাটছাট না করেই জীবনের সমগ্র পরিসরটাই ইসলামের আওতাধীন করো। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, আচরণ, ব্যবহারিক জীবন, লেনদেন এবং তোমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পুরোপুরি ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আনো। তোমাদের জীবনের কিছু অংশে তোমরা ইসলামের অনুশাসন মেনে চলবে, আর কিছু অংশকে ইসলামী অনুশাসনের বাইরে রাখবে, এমনটি যেন না হয়। তোমরা কখনও শয়তানের অনুসারী হয়ো না। শয়তান নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔

"নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ مَاجَاءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ (খ)
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"তোমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট হেদায়াত আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শুধু সৃষ্টির সেরা জীব করেই সৃষ্টি করেননি, তিনি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও শান্তিদায়ক করার জন্য হেদায়াত বা সঠিক পথের দিশাও দিয়েছেন। যারা আল্লাহর হেদায়াত অনুসরণ করবে তাদের চলার পথে কোন বিঘ্ন ঘটবে না।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াত আসবে তখন যারা আমার হেদায়াত অনুসারে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ আয়াত ৩৮-৩৯)

যারা আল্লাহর প্রদত্ত হেদায়াত বাদ দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত চলবে, তাদের জন্যই আল্লাহ এই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

আল্লাহ সীমাহীন শক্তির অধিকারী এবং তিনি জানেন কিভাবে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হয়। তিনি তাঁর পেয়ারা বান্দাদের জন্য যেমন সুখ-শান্তি ও নেয়ামতে ভরা পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তেমনি তাঁর নাফরমান বান্দাদের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ শাস্তির ব্যবস্থাও করে রেখেছেন।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ (গ)
وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ط

"তারা কি এই প্রতীক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ্ মেঘমালার ছায়া দিয়ে ফেরেশতাদের বিপুল জমায়েত সংগে নিয়ে তাদের সামনে এসে যাবেন এবং তখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে? সমস্ত ব্যাপার তো আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবির্তত হবে।"

এখানে উল্লেখিত শব্দগুলো যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগায়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা কেবল মাত্র একটি বিষয়ের উপরই চলছে। সত্যকে না দেখে সে তা মেনে নিতে প্রস্তুত কিনা? আর সত্যকে মেনে নেয়ার পরও তার মধ্যে সত্যকে অমান্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করার মত নৈতিক শক্তি তার আছে কিনা? কাজেই মহান আল্লাহ্ আসমানী কিতাব নাযিল, নবী প্রেরণ, এমনকি মুজিযাসমূহের ক্ষেত্রেও বুদ্ধি-বিবেকের পরীক্ষা ও নৈতিক শক্তি যাচাই করার ব্যবস্থা রেখেছেন। কখনও তিনি সত্যকে এমনভাবে চাপিয়ে দেননি যার ফলে মানুষের পক্ষে তাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। কেননা তদ্রূপ হলে তো আর পরীক্ষার কোন প্রয়োজনই থাকে না এবং পরীক্ষায় সাফল্য ও ব্যর্থতা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

তাই এখানে বলা হচ্ছে, সেই সময়ের অপেক্ষায় থেকো না যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাজ্যের কর্মচারী ফেরেশতাগণ সামনে এসে যাবেন। কারণ তখন তো সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। ঈমান আনার ও আনুগত্যের শির নত করার মূল্য ও মর্যাদা ততক্ষণই আছে, যতক্ষণ মানুষ এই দুনিয়ায় জীবিত আছে। মানুষ সুষ্ঠু যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাঁকে গ্রহণ করে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে এবং সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে নিজের নৈতিক শক্তির প্রমাণ দেবে।

প্রকৃত সত্য যখন সকল প্রকার আবরণমুক্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, মানুষ চর্মচোখে আল্লাহকে দেখবে, তাঁর মহা প্রতাপ ও পরাক্রমের সিংহাসনে

সমাসীন, সীমাহীন এ বিশ্ব সংসারের বিশাল রাজত্ব তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হতে দেখবে, ফেরেশতাদের দেখবে আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় এবং মানুষের এই সত্তাকেও আল্লাহর প্রচণ্ড শক্তির বাঁধনে একান্ত অসহায় দেখতে পাবে– যদি কেউ ঈমান আনে ও সত্যকে মেনে চলতে উদ্যত হয় তাহলে তার এই ঈমান আনার ও সত্যকে মেনে চলার কোন দাম নেই। সে সময় কোন পাক্কা কাফের, নিকৃষ্টতম অপরাধীও অস্বীকার ও নাফরমানী করার সাহস করবে না। আবরণ উন্মোচন করার মুহূর্ত আসার আগে পর্যন্ত ঈমান আনার ও আনুগত্য করার সুযোগ রয়েছে। আর যখন সেই মুহূর্তটি এসে যায় তখন আর পরীক্ষাও নেই, সুযোগও নেই। বরং তখন চূড়ান্ত মীমাংসার সময়।

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ط "যখন কারও কর্ম সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত এসে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তাকে কখনও অধিক অবকাশ দেন না।" (আল মুনাফিকূন : ১১)

শিক্ষা : ১। ঈমানের দাবিদারকে তাদের জীবনের সমগ্র পরিসরকে নিয়েই পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করতে হবে।

২। আল্লাহর হেদায়াতকে বাদ দিয়ে যারা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে তাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা কঠোর শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৩। দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা কেবলমাত্র একটি বিষয়ের উপরই চলছে। আবরণে ঢাকা সত্যকে না দেখে সে তা মানতে প্রস্তুত কিনা?

৪। সত্যের আবরণ উন্মোচন করার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান আনার ও আনুগত্য করার সুযোগ আছে।

বাস্তবায়ন : দারসের শিক্ষাগুলো গুরুত্ব দিয়ে যাতে আমলে পরিণত করা যায়, সেই চেষ্টা করার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ রেখে দারস এখানেই শেষ করছি। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

দারস : ১৫

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

৯৪. সূরা আলাম নাশরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৮, রুকূ-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - (٢) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ - (٣) الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ - (٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. (٥) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - (٦) اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - (٧) فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ - (٨) وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। (১) (হে নবী!)আমি কি তোমার বক্ষ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি তোমার উপর থেকে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, (৩) যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল, (৪) আর তোমারই জন্য তোমার খ্যাতি সুউচ্চ করে দিয়েছি, (৫) প্রকৃত কথা এই যে সংকীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ততাও রয়েছে, (৬) নিঃসন্দেহে আছে সংকীর্ণতার সঙ্গে প্রশস্ততা, (৭) অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই একান্তে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করবে, (৮) এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর।

শব্দার্থ : اَلَمْ نَشْرَحْ - আমরা কি প্রশস্ত করি নাই, لَكَ - তোমার জন্য, صَدْرَكَ - তোমার বক্ষ, وَضَعْنَا - আমরা নামিয়েছি, عَنْكَ - তোমা থেকে, وِزْرَ - বোঝা, اَلَّذِىْ - যা, اَنْقَضَ - ভেঙ্গে দিচ্ছিল, ظَهْرَ - পিঠ,

رَفَعْنَا - আমরা সুউচ্চ করেছি, ذِكْرَكَ - তোমার স্মরণ, فَاِنَّ - অতএব নিশ্চয়, مَعَ - সাথে, اَلْعُسْرِ - কষ্টের, يُسْرًا - সুখ, فَاِذَا - অতএব যখন, فَرَغْتَ- তুমি অবসর হও, فَانْصَبْ - তুমি তখন একান্তে ইবাদত কর, وَاِلٰى - এবং প্রতি, رَبِّكَ - তোমার প্রভুর, فَارْغَبْ - মনোনিবেশ কর।

নামকরণ : সূরার প্রথম বাক্যের প্রথম শব্দ দু'টিকেই এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, আল-ইনশিরাহ নামেও সূরাটি পরিচিত।

নাযিল হওয়ার সময়কাল : এই সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যে সূরা আদ্-দোহার সাথে গভীরভাবে মিল দেখা যায়। তাই সূরা দু'টি একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ সূরাটি মক্কা শরীফে আদ্-দোহার পরই নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : নবী করীম (সা)-কে শান্ত্বনা দান করাই এই সূরার মূল উদ্দেশ্য। নবুয়াত লাভের পর ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করার ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) যে সকল কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার পূর্বে কখনও তিনি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হননি। নবুয়াতের পর তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করতেই সমস্ত সমাজ ও জাতি যেন তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো, অথচ এ সমাজ ও জাতি তাঁকে ছোটবেলা থেকেই সম্মান করতো। তারাই এক সময় তাঁকে আল-আমীন উপাধি দিয়েছিল। আবার এখন তারাই তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। পথ চলাকালে লোকেরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। প্রতি পদে পদে সমস্যার সৃষ্টি করছে। কাজেই তাঁকে শান্ত্বনা দানের জন্য প্রথমে আদ্-দোহা এবং পরে এই সূরাটি নাযিল হয়।

এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সা)-কে যে তিনটি বড় বড় নেয়ামত দান করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন। এগুলো বর্তমান থাকতে আপনি নিরুৎসাহিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয় হবেন কেন? প্রথম নেয়ামত হলো, বক্ষদেশ উন্মুক্ত করা, দ্বিতীয়- কোমর ভাঙ্গা ভারবহ বোঝার অপসারণ, তৃতীয়- সুনাম ও সুখ্যাতিকে উঁচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, সমস্যা ও সংকটের মধ্য দিয়ে যে সময় আপনি অতিক্রম করছেন, তা সুদীর্ঘ নয়। সমস্যা, সংকট ও সংকীর্ণতার সাথে সাথে প্রশস্ততার সময়ও আসছে। সূরা আদ্-দোহায় এই কথাটিই এভাবে বলা হয়েছে, আপনার (নবী) জন্য প্রত্যেকটি পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায় অপেক্ষা উত্তম হবে। শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে এমন কিছু দান করবেন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, খুশীতে আপনার মন ভরে যাবে।

অবশেষে আল্লাহ্র নবীকে (সা) উপদেশ দেয়া হয়েছে, যখনই আপনি অবসর পাবেন তখনই আপনার প্রভুর ইবাদত ও আরাধনায় লেগে যাবেন। আর সমস্ত জিনিসের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের প্রভুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবেন। এ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই সমস্ত সমস্যা ও সংকটের মুকাবিলা করার শক্তি আপনার মধ্যে এসে যাবে।

ব্যাখ্যা : (ক) - اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

"(হে নবী) আমি কি তোমার বক্ষকে তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি?"

পবিত্র কালামে পাকের যেসব জায়গায় বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দু'টি অর্থ জানা যায়।

এক– সকল প্রকার মানসিক উৎকণ্ঠা ও দ্বিধা-সঙ্কোচ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে স্থির বিশ্বাস পোষণ করা যে, ইসলামই একমাত্র সত্য সঠিক দীন। اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ - "আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।"

সূরা আনআমের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ. - "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাঁর বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।"

সূরা যুমারের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ. - "যার

বক্ষদেশ আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি আলোর দিকে চলছে।"

দুই– মানসিক দৃঢ়তা, উদ্যম ও সাহসিকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, বৃহত্তর কোন কঠিন অভিযানে দ্বিধা-সংকোচ না করা এবং নবুয়াতের মহান দায়িত্ব পালনের সাহসিকতা সৃষ্টি হওয়া। আল্লাহ্ তায়ালা যখন হযরত মূসা (আ)-কে নবুয়াত দান করে ফেরাউনের সাথে সাক্ষাত করার হুকুম দিচ্ছিলেন তখন হযরত মূসা (আ) আরয করেন :

رَبِّ اِنِّىٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ. - "হে আমার প্রভু! আমার ভয় হচ্ছে তারা আমাকে অস্বীকার করবে এবং আমার বক্ষদেশ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।" (সূরা শুআরা : ১২-১৩)

সূরা ত্বা-হার ২৫-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْٓ اَمْرِىْ. - "হে আমার রব! আমার বক্ষদেশ আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও।"

(খ) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ.

"আমি তোমার উপর থেকে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।"

وِزْرٌ - (বিয্‌র) শব্দের এই আয়াতে অর্থ হচ্ছে 'ভারী বোঝা'। অন্যান্য আয়াতে 'পাপ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বোঝার অর্থ নিজ জাতির মূর্খতাসূচক, অজ্ঞতামূলক আচরণ ও জাহেলী কর্মকাণ্ড দেখে নবীজীর মন যেভাবে দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল, তা-ই এখানে বুঝানো হয়েছে। তিনি দেখছিলেন লোকেরা নিজ হাতে বানানো মূর্তির পূজা করছে। চারদিকে শির্‌ক, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি, যুলুম, নিপীড়ন ও লেনদেনে অসততা। শক্তিশালীদের পাঞ্জার নীচে শক্তিহীনরা পিষে মরছে। মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হচ্ছে। গোত্রে গোত্রে লুটতরাজ, প্রতিশোধমূলক লড়াইয়ের জের চলছে বছরের পর

বছর ধরে। কারো পক্ষে মযবুত জনবল না থাকলে তার ধন-প্রাণ, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা ছিল না। এই নির্মম পরিস্থিতি দূর করার কোন উপায়ই তিনি পাচ্ছিলেন না। এই চিন্তার বোঝাই তাঁর কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। নবুয়াতের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর ঈমান এমন একটি চাবিকাঠি যা দিয়ে মানব জীবনের সব রকমের বিকৃতির মূলোৎপাঠন করা যেতে পারে এবং জীবনের সকল দিকে সংশোধনের পথ পরিষ্কার করা যেতে পারে।

(গ) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. - "আমি তোমার স্মরণকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছি।"

মুহাম্মদ (সা)-এর শত্রু মক্কার কাফেররা তাঁর ক্ষতি করার জন্য হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হাজীদের তাঁবুতে গিয়ে এই মর্মে তাদেরকে সতর্ক করে দিত যে, এখানে মুহাম্মদ (সা) নামে একজন ভয়ংকর লোকের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি লোকদের উপর এমনভাবে যাদু করেন যার ফলে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রী মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কাজেই আপনারা তার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবেন।

অন্যান্য সময়ে ওমরা, যিয়ারত ও ব্যবসা উপলক্ষে যারা মক্কায় আসতো তাঁদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতো। শত্রুরাই সারা আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। শত্রুদের এ প্রচারের দ্বারাই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই লোকটি কে? কেমন তাঁর যাদু? যাদুর প্রভাবে মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন ইত্যাদি জানার আগ্রহ প্রবল হয়েছে। তারপর অনুসন্ধানের মাধ্যমে লোকেরা তাঁর চরিত্র ও কাজ-কারবারের সাথে পরিচিত হয়েছে। নবীজীর মুখে কুরআন শুনেছে। তিনি যেসব বিষয় পেশ করছেন তা জেনেছে। তারা যে যাদুর কথা বলছে তাতে যারা আকৃষ্ট হয়েছে তাদের জীবনধারা, আরবের সাধারণ লোকদের জীবন ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। কাফেরদের দুর্নাম এখন সুনামে পরিণত হয়ে যেতে লাগলো।

দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই, যে দেশে মুসলিম নেই। সুতরাং সারা বিশ্বে তাঁর নাম ও খ্যাতি উন্নত করে দিয়েছি।

সারা বিশ্বের মসজিদগুলোতে এবং যেখানে জামায়াতে নামায পড়া হয়, সেখানেই আযানের মাধ্যমে ঘোষিত হয় আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

নবী করীম (সা)-এর নামে দরূদ পড়া হয় পৃথিবীর সর্বত্র। তাঁর দরূদ ব্যতীত কোন দোয়াই কবুল হয় না। এভাবে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হজ্জব্রত পালনকারী হাজী সাহেবগণ নবী করীম (সা)-এর রওয়াযা শরীফ যিয়ারত করে সালাম জানান, আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।

সমস্ত পৃথিবীর ঈমানদার লোকদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ নবীজীর হাদীস পড়েন। হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর মানমর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ. - বলে সূরা কাওছারে নবীজীর সম্মান আল্লাহ তায়ালা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এভাবে অসংখ্য প্রকারে তাঁর খ্যাতি সমুন্নত করেছেন। এই মহিমান্বিত মর্যাদা তাঁকে আর কখনও ছেড়ে যাবে না।

(ঘ) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. "কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে। অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।"

একথাটির দু'বার পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূলে করীম (সা)-কে পুরোপুরি শান্ত্বনা দেয়া। এ সময় তিনি যে কঠিন ও সংকটময় অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। বরং অতিসত্বর এ অবস্থার অবসানের সাথে সাথে শুভ দিন ও কল্যাণময় অবস্থার উদ্ভব ঘটবে। সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা না বলে বলা হয়েছে সংকীর্ণতার সাথেই প্রশস্ততা। "সাথে" দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, প্রশস্ততার যুগ এত বেশী দ্রুত এগিয়ে আসছে মনে হয় যেন তা তার সাথেই চলে আসছে।

(ঙ) فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ. "কাজেই যখন

অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও এবং নিজের রবের প্রতি গভীর মনোযোগে আকৃষ্ট হও।"

যখন কোন ব্যস্ততা থাকবে না তখন এই অবসর সময়কে ইবাদতের পরিশ্রমে ও আধ্যাত্ম সাধনায় অতিবাহিত কর এবং অন্যসব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ কর।

শিক্ষা : ১। আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন। আমরাও আল্লাহ্‌র সম্মানিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক কামনা করবো।

২। দুঃখ ভোগ করলে যখন সুখ পাওয়া যায়, আমরা দুনিয়াতে দুঃখ ভোগ করে যেন আখেরাতে সুখ পেতে পারি সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

৩। যখন অবসর পাবো তখনই আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর মনোযোগে আকৃষ্ট হবো।

বাস্তবায়ন : এ দারসের শিক্ষা হিসাবে যে দফাগুলো নেয়া হয়েছে সেগুলো যেন আমরা সমাজে বাস্তবায়ন করতে পারি সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখা আমাদের সকলের একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাওফীক কামনা করছি, তিনি যেন আমাদের জীবনে উপরোক্ত শিক্ষাগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ দেন। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ্।